অপেক্ষা

(২০০৭)

সেলিনা হোসেন

অনিমা ও রাজীবের প্রেমের কথা

অনিমা ও রাজীবের প্রেমের কথা বেশি দিনের নয়। দূরখালি স্টেশনে অনিমার বাবা বদলি হয়ে এসেছে মাত্র ছ'মাস হলো। এর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেভাবে জমে উঠলে ভালোবাসার অতিরিক্ত আরো নানা ধরনের আসক্তির জন্ম হয় তেমন পর্যায়ে ওরা পৌঁছেনি।

স্টেশন মাস্টারের মেয়ে অনিমা। বাবার সঙ্গে স্টেশন থেকে স্টেশনে ঘুরে বেড়ায়। নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে থাকতে ভালো লাগে। ওর। বছর দুয়েক আগে মা মরে গেছে। ওর কোনো ভাইবোনও নেই। বি.এ পরীক্ষা দিয়েছে। ইচ্ছে আছে কোনো প্রাথমিক স্কুলে চাকরি করার। এখনো সে সুযোগ আসেনি। রাজীবের বাবা দূরখালি গায়ের কৃষক, অবস্থা মোটামুটি ভালো। সংসারে অভাব নেই। তবে ছেলেকে বি.এ পাসের পরে ঢাকায় পাঠিয়ে এম.এ পড়াবে এমন ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু ছেলের জোর তাগাদা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে একটা কিছু করবে এমন স্বপ্ন ওর ভেতরে আছে। এর পাশাপাশি বাড়তি যেটুকু ইচ্ছে তা হলো এম.এ পাস করতে পারলে দূরখালি গায়ের প্রথম ডিগ্রিধারী যুবক হবে ও। বাবাকে এই শর্তে রাজি করিয়েছে। ছেলে এম.এ পাস করলে বাবারও নামডাক হবে গাঁয়ে, এমন লোভ কোন বাবার না হয়!

একদিন ঢাকা যাওয়া ঠিক হয় রাজীবের। স্টেশনের প্লাটফর্মের শেষপর্যন্ত বাবা রাজি হয়েছে। খরচ চালাতে বাবার একটু কষ্ট হবে, তারপরও বাবা খুশি যে, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিতে পারব। বাবা গাঁয়ের প্রথম মানুষ হবেন, যার ছেলে এম.এ পাস করেছে।

হা হা করে হাসে রাজীব। সঙ্গে অনিমাও। হাসি থামলে রাজীব বলে, তবে আমি চেষ্টা করব টিউশনি করে বাবার কাছ থেকে যত কম টাকা নেয়া যায়। আর চেষ্টা করব কোনো কারণে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফিরতে।

অনিমার দু-চোখে ঝিলিক ওঠে।

সত্যি ফিরবে তো? এম.এ পাস করে তুমি ঢাকায় থেকে যাবে না তো?

মোটেই না, ঢাকায় থাকব কেন? আর যদি থাকতেই হয়, যদি চাকরি করি, তাহলে তুমি যাবে তো আমার সঙ্গে?

অনিমার ছেলেমানুষি কণ্ঠস্বরে কিছুটা বিস্ময় ধ্বনিত হয়, আমাদের ঘর হবে?

হবে, হবে, হবে। দুজনে আনন্দের স্রোতে ভেসে যায়। হাসি থামলে রাজীব দ্বিধা নিয়ে বলে, কিন্তু আমার একটা ভয় আছে অনিমা।

ভয়? অনিমার দম আটকে আসে।

ভয়ই তো। আমার দুবছরের পড়ার ফাঁকে তোমাকে যদি তোমার বাবা বিয়ে দিয়ে দেয়!

অনিমার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ধ্বনিত হয়, বাবা সে রকম চেষ্টা করলে আমি রাজি হবো না। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

কত দিন অনিমা? কত দিন?

অনিমা মাথা ঝাকিয়ে অবলীলায় বলে, যত দিন তুমি না ফিরো।

তাহলে এখন থেকে আমাদের অপেক্ষার শুরু।

হ্যাঁ, শুরু।

দুজনে হাত ধরে। দুজনের মাথার ওপর উড়ে বেড়ায় প্রজাপতি। দুজনে প্লাটফর্ম থেকে লাফিয়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায়। প্লটফর্ম ধরে নয়, ধানক্ষেতের আল ধরে যতটা পথ পাড়ি দেয়া যায় তত দূরে।

দুদিন পরে চলে যায় রাজীব। স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের লেজটুকু অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরেও অনিমার মনে হয় রাজীব যায়নি–ও একটু পরই রাজীবের কন্ঠ শুনতে পাবে। অকস্মাৎ এই ফাঁকা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর ভয় করে। মনে হয় চারদিক থেকে হলুদ জামা গায়ে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে। ওদের ফ্যাকাশে চেহারায় আলো নেই। ও চারদিকে তাকায়। যেন হলুদ আলোর প্রলেপ পড়েছে চারদিকে। গাছগুলো নিথর, পাতাগুলোর রঙ আর সবুজ নেই। চারপাশের ধানক্ষেতের ওপর হলুদের ছোঁয়া। গত বছর জন্ডিসে আক্রান্ত হলে বাবার চেহারাটা অমন হয়ে গিয়েছিল। ও বাবার কাছে যেতে ভয় পেত মনে হতো বাবাকে ধরতে গেলে বাবা মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। আর বাবা না থাকলে ও কার সঙ্গে কথা বলবে, কে ওকে বকুনি দেবে, কে ওকে বলবে, মেয়েটা আমার বুকের ভেতরে একটা বড় মাকড়সা হয়ে আটকে আছে, জাল বুনছে। আমি সেই জালে আটকা পড়া মাছি। অনিমা ভয়ে কুঁকড়াতে থাকে। মনে হয় ফাঁকা স্টেশনের গরুগুলো তেড়ে আসবে ওর দিকে, আর রাখাল বালকেরা ভাববে ও একটা ডাইনি, গরুগুলোকে নিয়ে গুহার ভেতরে চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে তেমন কিছু ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মায়ের কথা মনে হয় মরে যাওয়ার আগে মাকেও অমন হলুদ দেখাচ্ছিল–ফ্যাকাশে, বিবর্ণ। মৃত্যুর রঙ কি তাহলে হলুদ? নাকি কালো? ও দুহাতে মুখ ঢাকে।

তখন পেছন থেকে ওর বাবা তৌফিক ওর ঘাড়ে হাত রাখে।

একা একা দাঁড়িয়ে আছিস যে মা?

বাবা, মৃত্যুর রঙ কী?

মৃত্যুর আলাদা রঙ নেই। সব রঙের ভেতরই মৃত্যুর ছায়া আছে।

লাল রঙে আছে?

কেন থাকবে না। সন্ত্রাসীর গুলিতে মানুষ তো রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে। রক্তের রঙ লাল ছাড়া আর কী?

বাবা, মায়ের মৃত্যুর রঙ কী?

হলুদ।

হলুদ! আশ্চর্য, আমারও তাই মনে হয়েছিল।

বাড়ি চল মা। বাড়ি গিয়ে আমরা দুজনে তোর মায়ের ছবি দেখব।

ঠিক। চলো। ছবিতে মা আমাদের কাছে ফিরে আসবে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমার মনে হবে মা মরেনি। মা আমাদের সঙ্গেই আছে। ভাগ্যিস, দুটো অ্যালবাম ভরে মায়ের ছবি রেখেছি আমরা।

অনিমা বাবার হাত ধরে বাড়ি ফিরে, যেন ও শৈশবের অনিমা। বাবা ওকে গুড়বালি গাঁয়ের মেলায় নিয়ে অনেক খেলনা কিনে দিয়েছে। সেদিন গুড়বালি স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনটা ছেড়ে যাবার পরে দুর্ঘটনায় পড়েছিল। কে বা কারা রেললাইনের খানিকটুকু তুলে নিয়েছিল। বাবা ভীষণ মন খারাপ করেছিল। অনেক দিন ভাত খেতে

পারেনি। এক গভীর রাতে ওর ঘুম ভেঙে গেলে ও দেখেছিল, মা বাবাকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে।

সেই থেকে বাবা আবার ভাত খাওয়া শুরু করেছিল। এখন যদি আবার কোনো ট্রেন দুর্ঘটনায় বাবার মন খারাপ হয় তাহলে কে ওর বাবাকে ভাত খাইয়ে দেবে? মা তো নেই। তাহলে কি ওর বাবা ভাত না খেতে খেতে মরে যাবে! অনিমা নিজের ছেলেমানুষি ভাবনায় বিরক্ত হয়। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে বলে, বাবা আমি তোমার ছবির একটা অ্যালবাম। বানাতে চাই।

আমার তো অত ছবি নেই মা।

তুমি আর আমি শহরে গিয়ে অনেক ছবি তুলব।

তুলব, তোর কথাই ঠিক। আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে মা।

চলো, তোমাকে আগে খেতে দেই।

অনিমা রান্নাঘরে ঢুকলে তৌফিক চেঁচিয়ে মেয়েকে ডাকে। বাবার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক মনে হয় অনিমার কাছে। ও দ্রুত কাছে এসে বলে, কী হয়েছে বাবা?

আমি ভাত পরে খাব। আগে তোর মায়ের ছবি দেখব।

অনিমা আর কোনো কথা না বলে অ্যালবাম নিয়ে এসে বাবার সামনে রাখে। তৌফিক অনেকক্ষণ ধরে অ্যালবামের পাতা ওল্টায়। অনিমা চুপ করে বাবার পাশে বসে থাকে। কিছুতেই বুঝতে পারে না যে বাবার কী হলো। আজ ওর বাবা বেশ লম্বা সময় ধরে ছবি দেখছে।

বোহেমিয়ান তন্ময় আজো বাড়ি থেকে চুপচাপ পালানোর জন্য তৈরি হয়েছে। ওর যখন ইচ্ছে করে তখন ও হুটহাট যেখানে-সেখানে চলে যায়। যত দিন খুশি তত দিন থাকে। শুধু মাকে চিঠি লিখে নিজের খবরাখবর দেয়। সাবিহা বানু বলে, আমার ছেলের পায়ের নিচে সরষে। তন্ময়ের মনে হয়, মায়ের উপমাটা তো অনেককাল আগের কথা। ও নিজে ওর জন্য নতুন উপমা বানাবে। বেশ জুতসই উপমা, না ঠিক হলো না, আধুনিক উপমা, না তাও হলো না শেষ পর্যন্ত পরে ভাববে মনে করে ও ভাবাভাবি ক্ষান্ত দেয়। ওর প্রিয় জিনিস ক্যামেরা। শখ ছবি তোলা। সেজন্যই ওর হাজারো জায়গা খুঁজে বেড়ানো, যেন দারুণ একটি ছবি তুলতে পারে।

তখন ভোর হয়েছে মাত্র। দিনের প্রথম আলোর শুরু। তন্ময় বিছানা ছেড়ে প্রথমে জানালায় দাঁড়ায়। আলোর আভায় ফুটে ওঠা দিনের সূচনা। দেখে। ফিরে এসে বাথরুমে যায়। টেবিলের ওপর ব্যাগ আর ক্যামেরার ব্যাগ রাখা। রাতেই সব কিছু গুছিয়ে রেখেছিল। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েই মাকে চিঠি লেখে। ফুলদানির নিচে ভাজ না-করা চিঠিটা রেখে দেয়, যেন মা দূর থেকেই চিঠিটা দেখতে পায়। তাহলেই বুঝে যাবে যে ছেলেটা পালিয়েছে।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ও মায়ের ঘরে উঁকি দেয়। সাবিহা বানু ঘুমিয়ে আছে। ও নিজেকে বলে, মা কখনো ভোরে উঠতে পারে না। বেচারা ইনসমনিয়ার রোগী। বাবা মারা যাবার পরে সেটা আরো বেড়েছে। ও মৃদু স্বরে বলে, যাচ্ছি মা, তোমার জন্য চিঠি রেখে গেলাম। তুমি আমার কাছ থেকে শুধু এটুকুই তো চাও।

সিঁড়ি দিয়ে খুব নিঃশব্দে নামে। যেন বাড়ির কাজের মানুষদের ঘুম না ভাঙে। তাহলেই চেঁচামেচি শুরু করবে। মাকে জাগিয়ে ফেলবে। গেটের একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে ওর কাছে। ধীরেসুস্থে গেট খুলে বেরিয়ে যায় ও। গেটটা মুখে মুখে লাগিয়ে রাখে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে বলে, পুরো ধরিত্রী আমার।

ফুটপাথে বসে ছোট মেয়ে সখিনা ফুল গোছাচ্ছে বিক্রি করার জন্য। তন্ময় ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সখিনা হাসিমুখে ওর দিকে তাকায়। নিরন্ন, শুকনো চেহারার চোখজোড়া

দারুণ তীক্ষ্ণ। ওকে দিয়ে একটা কিছু হবে–তন্ময়ের মনে হয়। ও সখিনাকে বলে, তোমার একটি ছবি তুলি?

সখিনা চটপট উঠে দাঁড়ায়। একগুচ্ছ ফুল বুকের কাছে ধরে পোজ দিয়ে বলে, সুন্দর কইরা তুলবেন কিন্তু। আমারে একড়া ছবি দিবেন। আমার মারে দেখামু। মা খুশি হইয়া কইব, ও আল্লারে, আমার সখিনা কত সোন্দর! আল্লা অরে য্যান বাঁচাইয়া রাখে।

তন্ময় ছবি তোলে। কয়েকটা ছবি তুলে সখিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। এ বয়সে ও ফুল বেচবে কেন? ওর কি আরো কিছু পাওনা ছিল না? সখিনা বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে বলে, তাকায়ে আছ ক্যান? ছবি ভালো হয় নাই?

তন্ময় জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, না একটুও ভালো হয়নি। এটা কোনো ছবিই। এমন ছবি তুলতে আমার লজ্জা হয়।

সখিনার ভীষণ মন খারাপ হয়। বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, আমারে খুব খারাপ দেহাইতাছে?

তন্ময় ওর বিপ্ন দৃষ্টি উপেক্ষা করে অবলীলায় বলে, হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ দেখাচেছ।

আমারে দেহাও না। কেমুন খারাপ লাগতাছে আমি দেহি।

তন্ময় ওর ডিজিটাল ক্যামেরায় সখিনাকে ছবি দেখায়। সখিনা ছবি দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে, আল্লারে কী সোন্দর দেহাইতাছে!

তুমি খুশি হয়েছ সখিনা?

সখিনা ঘাড় কাত করে লম্বা করে টেনে বলে, হ–খুব খুশি হইছি। আমার মাও খুশি হইব। কইব, ও আল্লারে আমার সখিনা তো একডা ফুটফুইটা মাইয়া!

তন্ময় হো-হো করে হাসে। সখিনার স্মার্টনেস দেখে খুব মজা পায়। তারপরও বলে, কিন্তু এটা তোমার ছবি নয়। তোমার ছবি এমন হওয়া উচিত। তন্ময় ওকে অন্য

একটা ছবি দেখায়। সখিনা ছবি দেখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। স্কুল ইউনিফর্ম পরে বই-খাতা হাতে নিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে ও উৎফুল্ল হয়, তারপর আবার বিষণ্ন হয়ে যায়। বলে, ধুত এইডা আমার ছবি না। আমি তো কোনো দিনই স্কুলে যাই নাই। আপনে মিছা ছবি তোলেন ক্যান?

সখিনা ফুলের গোছা উঠিয়ে নিয়ে গোছগাছ করতে করতে তন্ময়ের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তন্ময় অবাক হয় না। ও তো আগেই বুঝে নিয়েছিল যে সখিনা মেধাবী, ওর চোখ সে কথা বলে দেয়। ও চিন্তা করতে পারে। ও তো মুহূর্তে বুঝতেই পারবে যে ওর অবস্থান কোথায়। ও দেখতে পায় ও ফুল নিয়ে রাস্তায় সিগনাল বাতির নিচে গিয়ে। দাঁড়িয়েছে। এখন শুরু হবে ওর ছোটাছুটি। এ সত্য ওর চেয়ে বেশি কে কঠিনভাবে জানে! ও নিজেকেই বলে, তুমি বললে এটা মিথ্যে ছবি। এটাই তো সত্য হওয়া উচিত সখিনা। এই সত্য ছবির ধারণা থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তোমাকে এই জীবনের ধারণাও পেতে হবে।

তন্ময় হাঁটতে থাকে। রাস্তার ধারের ঝুপড়ি চায়ের দোকান খুঁজতে থাকে। তখন রাস্তা সরব হয়ে উঠেছে। গাড়ি-রিকশায় সয়লাব হয়ে উঠেছে রাস্তা। ও আবার দাঁড়ায়। ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা তাক করে।

তখন সাবিহা বানুর ঘুম ভাঙে। বুকটা খচ্ করে ওঠে। তন্ময় কি ঘরে আছে? ছেলেটা যখন উধাও হয় একটু বলেও যায় না। আগে বলত আর মায়ের কাছ থেকে বাধা পেত। মন খারাপ করে বসে থাকত। কিছুকাল ঘরে থেকে ও না বলে চলে যাওয়ার উপায় বের করেছে–একটা চিঠি এখন মা-ছেলের সেতুবন্ধ।

সাবিহা বানু তন্ময়ের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ওর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘর খালি। ওর ব্যাগ এবং ক্যামেরা নেই দেখে সাবিহা বুঝে যায় যে, ছেলে উধাও হয়েছে। নিশ্চয় ফুলদানির নিচে চিঠি রেখে গেছে। সাবিহা ঘরে ঢুকে চিঠিটা নেয়। তন্ময় লিখেছে, মা, বরাবরের মতো আবারো বেরিয়ে পড়েছি। একটুও ভেব না। আমি জানি তুমি কখনোই ভাব না যে ছেলেটা বখে গেছে। তুমি ভাব ছেলেটা নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। সোনা মা আমার, প্রজাপতি মা আমার। কিছু ভেব না।

অল্পদিনে ফিরে আসব। অনেক আদর আর ভালোবাসা। তোমার আদরের ছেলে বাজপাখি তন্ময়।

সাবিহা বানু বিষণ্ন হয়ে চিঠিটা একটি ছোট সুন্দর কাঠের বাক্সে রাখে। দেখা যায় অনেক রঙের কাগজে লেখা অনেক চিঠি জমে আছে। কখনো কোনো চিঠি ফেলে দেয়নি সাবিহা বানু। প্রথম দিকে টেবিলের ড্রয়ারে চিঠিগুলো রেখে দিত। তারপর একটি সুন্দর বাক্স কেনে। আজো চিঠিটা দুতিনবার পড়ে বাক্সে ঢুকিয়ে রাখে।

তন্ময়ের ঘরটা নিজেই গোছায়। যেখানেই যায় সেখান থেকে কিছু নাকিছু আনবে। ফলের বীচি, গাছের গোটা, রঙিন পাতা, দোকানের কিছু, একটি রুমাল কিংবা বাঁশের ফুলদানি, মাছ ধরার খলুই, বাবুই পাখির বাসা ইত্যাদি হরেক জিনিস। ঘরজুড়ে ছড়িয়ে থাকে। সাবিনা বানু কোনোটা দেয়ালে টানায়, কোনোটা ঘরের এখানে-সেখানে সাজায়। বাড়ি ফিরে তন্ময় চেঁচিয়ে বলবে, মা, আমার বাবুই পাখি মা। ঠিক বাবুই পাখির বাসার মতো বুনেছ আমার ঘর। সাবিহা বানুর মনে হয় ছেলের কন্ঠ শুনতে পাচ্ছে ও। শুধু ও এখন সামনে নেই।

তখন ফুলমসি স্টেশন মাস্টারের ঘরে তৌফিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত। দু-মাস হলো দূরখালি স্টেশন থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছে। জায়গাটা পছন্দ হয়েছে অনিমার। আসার পরপরই স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেয়েছে। একজনের লিভ ভ্যাকান্সিতে অবশ্য। তাতে কী, মেয়েটার সময় তো কাটবে। হঠাৎ হঠাৎ ওর চোখে জল দেখলে চমকে ওঠে তৌফিক। ভয় হয়। মেয়ের ভাবনায় হাতের কাজ থেমে যায়। চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দেয়ার সময় শুনতে পায় অনিমার কন্ঠ। বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলছে। একটু পরে ঘরের ভেতর মুখ বাড়ায়।

বাবা কি করছ?

আয় মা। তুই কী করছিলি?

স্কুল থেকে এসে তোমার জন্য দুটো কই মাছের দোপেঁয়াজা করেছি বাবা। চিংড়ি দিয়ে মিষ্টি কুমড়ো ভাজি করেছি। তুমি খেয়ে বলবে আমি মুগের ডালটা খুব ভালো বেঁধেছি।

বাহ্, শুনেই আমার পেট ভরে যাচ্ছে। এই নতুন স্টেশনে এসে তোর কি ভালো লাগছে মা?

হ্যাঁ, বাবা, খুব ভালো লাগছে, ঘর-দুয়ার গোছাতেই যা একটু কষ্ট হয়।

তুই তো দিব্যি কদিনের মধ্যে বেশ গুছিয়ে ফেলেছিস। আমার কাজের মেয়ে, সোনাকুট্টি মেয়ে।

তুমি যে আমাকে কত ভালোবাস বাবা! আকাশের সমান, পাহাড়ের সমান।

হা হা করে হাসে অনিমা। তৌফিকও। দুজনেরই মনে হয় এসব বলার কথা নয়। তবু বলতে ভালো লাগে, বলাটা মজার হয় এবং কখনো ছোটবেলার খেলার মতো। হাসি থামলে তৌফিক বলে, তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি, তোর বিয়ে হলে আমার কী হবে!

মেয়ের দিকে তাকিয়ে তৌফিক চোখ মোছে। অনিমা বাবার দিকে তাকিয়ে প্রথমে থমকে যায়, তারপর বলে, বাবা তুমি এমন করলে আমার যেদিক দু-চোখ যায় সেদিকে চলে যাব। স্টেশনে কেউ নেই, আমি এখন বাইরে গিয়ে ঘুরে বেড়াব। তুমি কাজ করো। ফাঁকা স্টেশন অনিমার বেশ লাগে। হুহু বাতাস এ-মাথা থেকে ও-মাথায় বয়ে যায়। গত পনেরো দিন রাজীবের কোনো খুব নেই। ও অবশ্য যাবার সময় বলে গিয়েছিল, আমার চিঠি না পেলে একটুও ভেব না। মনে করো যে আমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

কিন্তু কদিন ধরে অনিমার কিছু ভালো লাগছে না। কোনো কিছুতে মন বসছে না। স্কুলের বাচ্চাগুলোর সঙ্গেও অনেক সময় কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ও স্টেশনের সিমেন্টের বেঞ্চের ওপর পা উঠিয়ে বসে। তখন একটি কাগজ হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে মাসুম।

আপা–

মনে হয় আপা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর দম বুঝি ফুরিয়ে যাচ্ছে। লম্বা শ্বাস ফেলে মাসুমের চোখ জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কী হয়েছে মাসুম?

এই দেখেন।

ও কাগজটা মেলে ধরে।

একটা দুর্ঘটনার খবর ছাপা হয়েছে।

কাগজটা রেখে ও চলে যায়। অনিমা কাগজ হাতে নিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনায় নিহত রাজীবের ছবি ও রাজপথে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ছবির নিচে লেখা আছে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের ছাত্র রাজীব সরকার বাসের ধাক্কায় দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অনিমা কাগজটা বুকে জড়িয়ে ধরে হাঁটুতে মাথা গোজে। না ঠিক হচ্ছে না। ও এখন চিৎকার করে কাঁদতে চায়। চিৎকার করে বলে, এই তোমার ফিরে আসা—এভাবে–চারদিকে হা-হা শূন্যতার মাঝে অনিমার বোবা কান্না প্রবল শূন্যতায় বাতাস ভারী করে তোলে।

একটু পরে ট্রেন আসবে। দু-চারজন করে লোক প্লাটফর্মে জমায়েত হতে শুরু করেছে। অনিমা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়। কেউ কেউ ওকে দেখে। তারপর পোটলা-পুঁটলি নিয়ে এক জায়গায় বসে পড়ে। মাসুম তাহেরাকে নিয়ে অনিমার কাছে আসে।

আপা দেখেন, চাচি শহরে কাজ খুঁজতে যাচ্ছে। গাঁয়ে আর থাকবে না।

অনিমা চোখের জল মুছে বলে, কী হয়েছে চাচি?

কিছু হয় নাই।

তাহেরা বেঞ্চের ওপর বসে। অনিমা জানে কয়েক মাস আগে তাহেরার স্বামী আর একটা বিয়ে করেছে। ওদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। সে দুঃখেই তাহেরা বাড়ি ছাড়ছে। বাড়ি ছাড়লেই কি তাহেরার ঠিকানা খোজা শেষ হবে? অনিমা তাহের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কত বয়স হবে? তিরিশ থেকে চল্লিশ, নাকি আরো কম। গ্রামের মেয়েরা পুষ্টির অভাবে দ্রুত স্বাস্থ্য হারায়। তাদের বয়সটা চোরা-বয়স হয়।

কী দেখো মা?

আপনার সাহস আছে।

সংসারে লাথি মারা কি সাহস?

অনেক বড় সাহস। আপনি তো মুখ বুজে সহ্য করেননি।

ফুঃ। তাহেরা ঠোঁট ওল্টায়। তুমি কাঁদছিলা কেন?

এমনি।

তখন হুস-হুস শব্দে ট্রেন ঢোকে। লোকজন যে যার মতো গাড়িতে ওঠার জন্য তৈরি হয়। তাহেরাও পোটলা নিয়ে রেডি হয়। যাবার আগে অনিমার হাত ধরে চাপ দেয়। অনিমা কিছু বলার আগেই চলে যায়। ওর মনে হয় মানুষটি কি ওকে শক্তি সঞ্চয়ের সাহস দিয়ে গেল? আহ, ওর চোখ আবার জলে ভরে যায়। মাসুম সবুজ পতাকা ওড়াচ্ছে। ট্রেন স্টেশন ছাড়িয়ে চলে যায়, লেজটুকুও আর দেখা যাচ্ছে না। মাসুম ওকে ডাকে।

আপা, বাড়ি যাবেন না? ওঠেন আপা।

অনিমা ওর সঙ্গে কথা না বলে বাবার অফিস ঘরে গিয়ে ঢোকে। তৌফিক কাজ থেকে মুখ না তুলেই বলে, আয় মা।

তুমি আমার দিকে তো তাকালে না বাবা?

আমার মেয়ের পায়ের শব্দ আমার বুকের ভেতর টুনটুন বাজে। তাই মুহূর্তে বুঝে যাই যে কে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবা, আমার প্রিয় বাবা।

আজ কেমন লাগল তোর ট্রেন চলে যাওয়ার দৃশ্য?

বাবা তোমাকে না বলেছি আমি যত দৃশ্য দেখি এটা হলো সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য।

তৌফিক কাজ থামিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে পেপারওয়েটটা ঘোরায়। টেবিলের ওপর মৃদু শব্দ হয়। যেন কোনো ছন্দে বোল উঠেছে। অনিমা কান পেতে শব্দ শোনে। তারপর বলে, বাবা তুমি কোনো বড় স্টেশনে বদলির চেষ্টা করো।

কেন মা?

তাহলে আমার এম.এ পড়া হবে।

তৌফিক হেসে বলে, বি.এ পাস করেছিস, এই তো অনেক। লেখাপড়া কি শুধু ডিগ্রি দিয়ে হয়? আমি চাই এর চেয়েও ছোট কোনো স্টেশনে যেতে।

অনিমার কৌতূহলী কণ্ঠের উচ্চারণ, কেন বাবা?

তৌফিক একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তোর মা ছোট স্টেশনে থাকতে ভালোবাসত।

তখন আমি ছোট ছিলাম বাবা। প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম।

তুই চাইলে তোকে আমি হোস্টেলে রেখে এম.এ পড়ার সুযোগ করে দিতে পারি। তুই আমার একটা মাত্র মেয়ে। তোর খরচ আমি চালাতে পারব।

অনিমা অভিমানী কণ্ঠে বলে, তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা আমি ভাবি বাবা। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

ছিঃ মা, আমি তা ভেবে বলিনি। তুই আমাকে ছেড়ে যাবি কেন, পড়তে যাবি। বড় জায়গায় যাবি, ক্যারিয়ার গড়বি। শুধু কি প্রাইমারি স্কুলে পড়ালেই হবে। তাই না? তুই যেখানে যাবি আমিও তোর সঙ্গে সেখানে যাব।

স্বপ্নের মতো লাগছে তোমার কথা শুনতে। তোমার মতো বাবা আছে বলেই তো আমি মায়ের কষ্ট ভুলে থাকতে পারি।

বাবাকে শুধু বলা হয় না যে রাজীব নেই। রাজীব না থাকার দুঃখ বাবার কথায় আশ্রয় পায়। বাড়ি ফিরে তৈরি হয়ে স্কুলে যায়। স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওর আরেক আশ্রয়। কত গরিব ঘর থেকে ওরা পড়তে এসেছে। গান শুনতে ভালোবাসে। ছবি আঁকতে চায়। বোর্ডে অঙ্ক করতে দিলে অনায়াসে যোগ-বিয়োগ করে ফেলে। এইসব ছেলেমেয়ে এই গাঁয়ের সীমানার পরে আর কিছু চেনে না। তবুও আজ বারবার ওর মন খারাপ হয়ে যায়। স্কুলের হেড মাস্টার আজ আসেনি। অন্য টিচাররা নানা কাজের অজুহাতে চলে গেছে। তখন পুরো স্কুলে নিজেকে একা মনে হয় না, মনে হয় ঈশ্বরের মতো, পুরো পৃথিবীটা নিজের হাতের মুঠোয় পাওয়ার আনন্দ। ও সব ছেলেমেয়েকে এক ক্লাসে ডেকে বলে, আজ আমি তোমাদের একটা গান শেখাব। রোজ যেমন শেখাই, তেমন। তবে আজ হবে নতুন গান।

আমরা শিখব আপা।

তৈয়বা বিষণ্ন মুখে বলে, আপা আমি বাড়ি যাব।

কেন? তোমার কী হয়েছে তৈয়বা?

আমার মায়ের অসুখ।

ঠিক আছে তুমি যাও। আমি বিকেলে তোমার মাকে দেখতে যাব।

অনিমা ছেলেমেয়েদের গান শেখাতে চাইলেও ওর কোনো গান মনে আসে না। ওর বুকের ভেতরটা যে স্তব্ধ হয়েছে সে ঘোর ওর কাটেনি। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে চোখ মুছে বলে, তোমরা বাড়ি যাও সবাই। আজ ছুটি।

ছুটি?

হ্যাঁ।

আমরা আপনার বাড়ি পর্যন্ত যাব। আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব আপা।

না, তোমাদের উল্টো দিকে যেতে হবে না।

না, আমরা যাব।

কেন?

আপনার যে মন খারাপ সেজন্য।

ঠিক আছে এসো।

মেঠোপথে আজ অনিমার পা চলে না। ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে ওর শেখানো গান গাইছে। একদল ওর সামনে, একদল পেছনে। কিন্তু অনিমার মনে হয় ও কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ওর এমন করে বধির হয়ে যাওয়া বড় কষ্টের।

কমলাপুর রেল স্টেশনে তন্ময় চুপচাপ বসে আছে। জুতসই কোনো দৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে না, ক্যামেরা ব্যাগেই বন্দি। খানিকটুকু অস্থিরতায় ফাঁকা প্লাটফর্মে ঘোরাফেরা করে। একসময় তাহেরাকে দেখে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তাহেরা ওকে দেখেই বলে, তোমারে আমার চেনা চেনা লাগে কেন বাজান?

তন্ময় মৃদু হেসে বলে, আর একজনমে আপনি বোধহয় আমার মা ছিলেন।

তাহেরা ভ্রু কুঁচকে চিন্তিত স্বরে বলে, মা আছিলাম? না আমার কোনো সন্তান হয় নাই। এর লাইগাই তো আমার স্বামী আবার বিয়া করছে। সেই দুঃখে আমি বাড়ি ছাইড়া চইলা আসছি। আল্লাহ যে ক্যান আমারে একটা সন্তান দিল না।

তন্ময় সন্তান প্রসঙ্গে না গিয়ে বলে, আপনি এখন কী করবেন?

তাহেরা সহজ কণ্ঠে বলে, একড়া বাসায় কাম লমু।

বাসায় কাজ নেবেন? একটু ভেবে ও বলে, আমি আপনাকে একটা বাসা ঠিক করে দেব। থাকবেন? ভালো বাসা। আপনার কোনো কষ্ট হবে না।

তোমার কেউ হয় বুঝি? তোমার কেউ হইলে আমি একশবার থাকমু।

আপনি বসেন, আমি একটা চিঠি লিখে দেই।

তন্ময় ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বের করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিঠি লেখে–'সোনা মা আমার, আমি তোমার একজন সঙ্গী পাঠালাম। তুমি তাকে বাসায় থাকতে দিও রিজিয়া বুয়া চলে যাওয়ার পরে তুমি বড় একা হয়ে গেছ। এসব গ্রামের মানুষের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা থাকে মা। আমার বিশ্বাস যাকে পাঠাচ্ছি তার সঙ্গ তোমার ভালো

লাগবে মা। আর যদি ভালো না লাগে তাহলে বিদায় করে দেয়ার পথ তো খোলাই থাকে। আমাদের মানবিক বোধে বড় ঘাটতি আছে মা। তোমার নটেগাছ তন্ময়।'

চিঠিটা ভাঁজ করে তাহেরাকে দেয় তন্ময়।

আমি যে বাড়িতে আপনাকে রেখে আসব তাঁর কাছে গিয়ে চিঠিটা দেবেন।

তাহের ভীত কণ্ঠে বলে, আমারে যদি ভাগায়ে দ্যায়? তহন আমি কই যামু?

আপনি বাড়ির গৃহিণীকে এই চিঠিটা দিলে তিনি আপনাকে ভাগাবেন। আর যদি ভাগিয়ে দেন তাহলে অন্য একটা বাসা খুঁজে নেবেন। পারবেন না?

তাহেরা সজোরে মাথা নেড়ে বলে, খুব পারমু। পথে নামতে পারছি। আর পথ চিনতে পারমু না!

অকৃত্রিম সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাহেরার মুখ। তন্ময় মুগ্ধ হয়ে যায়। এমন চেহারাই তো ও পথে পথে দেখতে চায়। ক্যামেরা বের করতে করতে বলে, আপনি খুব সাহসী মহিলা চাচি। আপনার একটা ছবি তুলি?

তাহেরা খুশি হয়ে বলে, ছবি তুলবা বাবা, তোল তোল। সোন্দর কইরা তুলবা। আমারে য্যান পরীর মতো দেহায়।

তাহেরা শাড়িটা টেনেটুনে ঠিক করে পোজ দেয়। তন্ময় আপন আনন্দে অনেকগুলো ছবি তোলে। তারপর তাহেরাকে নিজের বাড়ির গেটে পৌঁছে দিয়ে দারোয়ানকে বলে, ওনাকে মায়ের কাছে নিয়ে যান।

তুমি যাইবা না বাবা?

না, আমার একটু কাজ আছে। ভয় নেই, আপনি গিয়ে মাকে আমার চিঠি দেখান।

তাহেরা দারোয়ানের সঙ্গে সাবিহা বানুর কাছে গিয়ে চিঠিটা দেয়। সোফায় বসে সাবিহা বানু চিঠিটা পড়ে। দুর-তিনবার পড়ে। তাহেরা মেঝেতে বসে আছে। উত্তষ্ঠা, দুরুদুরু বুক। এ বাড়িতে একটা ঠাঁই মিলবে তো? সাবিহা চিঠি পড়ে তাহেরীর দিকে তাকায়। মৃদু হেসে বলে, আমার ছেলে তোমাকে পছন্দ করেছে। আমার কি সাধ্য আছে ওর হুকুম পালন না করার! পালন করতে না পারলে আমার বুক ভেঙে যাবে।

তাহেরা সাবিহা বানুর কথায় সুর ধরতে না পেরে বলে, পোলাডা খুব ভালো আম্মা। আপনের কে হয়?

সাবিহা চমকে ওঠে।

আমার কে হয়? তারপর চমক ভাঙলে দ্রুত কণ্ঠে বলে, আমার ছেলে হয়, ছেলে, ছেলে। হ্যাঁ, ও খুব ভালো ছেলে। আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

পরক্ষণে ম্লান হয়ে যায় দৃষ্টি। চিঠিটা হাতে নিয়ে তন্ময়ের ঘরে আসে। পেছনে তাহেরাও। চিঠিটা বাক্সে রেখে তাহেরার দিকে তাকিয়ে বলে, এটা আমার ছেলের ঘর। তোমার নিজ হাতে ঝেড়েমুছে রাখবে।

এইডা তো আমার লাইগা একডা পবিত্র ঘর। আল্লাহর রহমত। আম্মা খাড়ান, আপনেরে একটা সালাম করি।

তাহেরা সাবিহার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। সাবিহা নিজের মনেই বলে, পাগল ছেলেটা যে এখন কোথায় আছে!

তন্ময় তখন আবার কমলাপুর রেল স্টেশনে ফিরে এসেছে। ট্রেনে উঠেছে। ট্রেন চলতে শুরু করলে ও কিছুক্ষণ সিটের গায়ে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে থাকে। শহরের জঞ্জালভরা এলাকাটা পার হয়ে গেলে তবে ও জানালা দিয়ে তাকাবে নিসর্গ এবং মানুষ দেখার জন্য। অনেকক্ষণ পরে ও ব্যাগ থেকে লেখার প্যাড বের করে মাকে চিঠি লেখে :

সোনা মা আমার–। ইতি তোমার সাদা কবুতর তন্ময়। কাগজটা জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। উড়ে যাওয়া কাগজটার একটা ছবি তোলে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অনিমার মনে হয় ওর চারদিকের নেমে আসা আকাশের ঘেরাটোপে ও বন্দি। চারদিকে ছোপ ছোপ রঙের মতো দুঃখগুলো সাঁটা হয়ে আছে। যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে সেখানেই রাজীবের মুখ। রক্তাক্ত। রাজপথের পিচের সঙ্গে সেঁটে থাকা এবং খ্যাতলানো। মেঠোপথের কোথাও বসে পড়বে কি-না ভাবতেই মাঠের চড়ইগুলো ঝাক বেঁধে উড়ে যায়। ওর আর বসা হয় না। দেখতে পায় স্কুলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ওর দিকে আসছে। অনিমা খুশি হয়ে ভাবে, ওরা আমার আশ্রয়। ও ওদের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। দূর থেকে স্টেশনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লাইনম্যান মাসুম এক কোনায় বসে আপন মনে খঞ্জনি বাজায়। অনিমা একটি বুনোফুল তুলে খোঁপায় পরে। মনে মনে বলে, তোমায় দেব বলে এই ফুলটি খোপায় রাখলাম প্রিয়তম।

ও ছেলেমেয়েরা কাছে এসে বলে, আপা আমরা এসেছি।

বেশ করেছ। এখন তোমরা একটা দৌড় দাও তো, দেখি কে আগে যেতে পারে।

দুলি বলে, আমরা গিয়ে কী ছোঁব?

মন্টু মহাউৎসাহে আঙুল তুলে বলে, ওই দূরের গাছটা।

অনিমা ঘাড় নাড়ে, গাছ নয়, তোমাদেরকে মানুষ ছুঁতে হবে।

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, হ্যাঁ, আমরা মানুষ ছোঁব।

অনিমা বলে দেয়, ওই যে স্টেশনের প্লাটফর্মে লাইনম্যান মাসুম বসে আছে তাকে ছুঁতে হবে।

ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করে ওঠে, ঠিক আছে তাই হবে। আমরা গেলাম মাসুম ভাইকে ছুঁতে।

মন্টু অনিমাকে ছুঁয়ে বলে, আপা আমরা মাসুম ভাইকে গিয়ে বলব, আপনার খনিটা আমাকে দেন।

সাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে, দেবে কচু। খঞ্জনি মাসুম ভাইয়ের প্রাণের জিনিস।

তোমরা গিয়েই দেখো না। দিতেও তো পারে।

অনিমার কথার প্রতিধ্বনি ওরাও করে, হ্যাঁ দিতেও তো পারে। চল দৌড়াই।

অনিমার মনে হয় ওরাও একঝাঁক চড়ুইয়ের মতো উড়ে যাচ্ছে। ওরাও উড়ে যাবে নীলিমার কাছে। বলবে, আকাশ, আমরা এসেছি। আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, রোদ দাও। ধান দাও। ভাত খাব, খঞ্জনি বাজাব, পূর্ণিমার রাতে উৎসব করব। আমাদের অনেক কিছু করার আছে আকাশ। এসব ভাবনা ভাবনাই। অনিমার মন আবার খারাপ হয়ে যায়। দেখতে পায় ছেলেমেয়েরা মাসুমকে ঘিরে ধরেছে। ও বাড়ির পথে যায়।

দুলি বলে, আপনার হাতটা আমাদের দিকে বাড়ান মাসুম ভাই।

মাসুম হকচকিয়ে যায়। ভ্রু উঁচিয়ে বলে, কেন?

আপা আমাদেরকে বলেছে মানুষকে ছুঁতে। আমরা আপনাকে ছোঁব।

আপা যখন বলেছে তাহলে তো সেটা মানতেই হবে।

মাসুম ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ধরো।

ছেলেমেয়েরা ওকে সঙ্গে নিয়ে নাচতে থাকে। সুর করে গায়–'আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি/রেলগাড়ি ঝমাঝম/পা পিছলে আলুর দম...।'

নাচতে নাচতে ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা করে পড়ে যায়। আর হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, মাসুম ভাই আমাদের যদু মাস্টার। মাসুম অই রেলগাড়িতে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। আমরা সবাই বরযাত্রী হবো।

হি-হি করে হাসে সবাই। মাসুম ওদের ধমক দিয়ে বলে, অ্যাই পোলাপান থাম। থাম বলছি।

ওরা হাসতে হাসতে খালি প্লাটফর্মে দৌড়াদৌড়ি করে।

অনিমা তখন নিজের শোবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে দু-হাতে মুখ ঢাকে। রাজীবের কোনো ছবি নেই ওর কাছে। এত অল্প সময়ের পরিচয়ে ছবি রাখা হয়নি। ভেবেছিল সুযোগ হলে দুজনে একটা ছবি তুলবে। সে সুযোগ আর হলো না। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, মা বড় শূন্য করে রেখে গেলে আমাদের। এই খালি ঘরটা খাঁ-খাঁ করে। একজনের না থাকা যে কত ভয়াবহ তুমি কি তা কখনো বুঝেছিলে মা!

অনিমা নিজেকে সামলে নিয়ে স্নান করতে যায়। হঠাৎ ট্রেনের শব্দ ওকে চমকে দেয়। বাথরুমে আর ঢোকা হয় না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোঝে যে বাবুগঞ্জের ট্রেনটা এসেছে। ও দ্রুত বাইরে এসে দাঁড়ায়। রাজীবের জন্য ওর অপেক্ষা ফুরোয় না।

ট্রেন থেকে নামে তন্ময়। কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। সঙ্গে আর একটি ছোট ব্যাগ। ট্রেন চলে গেলেও ও দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রেন কোন দিকে যাবে বুঝতে পারে না। নতুন জায়গায় তো ঝট করে পা বাড়ানো যায় না। দূর থেকে অনিমার দিকে চোখ পড়ে। দৃষ্টি ফিরিয়ে সবুজ ফ্ল্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মাসুমের দিকে চোখ পড়ে। বেশ লাগে ওকে দেখতে। জিজ্ঞেস না করেই ওর একটা ছবি তোলে।

মাসুম দু-পা এগিয়ে এসে বলে, ছবি তুললেন যে?

তন্ময় ওর ঘাড়ে হাত রেখে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলে, ছবি তোলা নেশা। ছবির মধ্যে মানুষ খুঁজি। অনেকগুলো ছবি একসঙ্গে করলে মানুষের মুখ যে কত রকম হয় তা বোঝা যায়।

মাসুম ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, তাতে আপনার কী লাভ?

তন্ময় মাথা নাড়ে। ঘনঘন মাথা নাড়লে ওর চুলগুলো কপালের ওপর ছড়িয়ে যায়। অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বলে, লাভ? লাভের কথা ভেবে দেখিনি কখনো। ওটা ভীষণ কঠিন কাজ।

আপনি কী করেন?

এই ছবিই তুলি।

এতে রোজগার হয়?

রোজগার!

মানে নিজের খরচ চালান কী দিয়ে?

এর মধ্যে তন্ময়ের দৃষ্টি আবার অনিমার দিকে যায়। দেখতে পায় অনিমাও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও ভেতরে ভেতরে কৌতুক বোধ করে। পরক্ষণে মাসুমের দিকে তাকিয়ে বলে, ও হ্যাঁ, খরচের কথা বলছিলে তো। মা আমাকে ছবি তোলার পড়ালেখার জন্য বৃত্তি দেয়। সেই টাকা দিয়ে আমি লেখাপড়া করি।

আপনার মায়ের বুঝি অনেক টাকা?

হ্যাঁ, অনেক টাকা।

ইস আমার যদি এমন মা থাকত! আমার মায়ের কেবল অভাব।

টাকাঅলা মা থাকলে কী করতে?

আমার গাঁয়ের সব ছেলেমেয়েকে খঞ্জনি বাজানো শেখাতাম।

হা-হা করে হেসে ওঠে তন্ময়। হাসতে হাসতে দেখতে পায় অনিমা আর নেই। ও বাড়িতে ঢুকে গেছে। যে দেয়ালের গায়ে ও হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে নিশ্চয় অনিমার ফসিলের চিত্র আছে। যারা মুহূর্তে অদৃশ্য হয় তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন। তন্ময়কে স্টেশন মাস্টারের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মাসুম তিক্ত স্বরে বলে, আপনি এই স্টেশনে নেমেছেন কেন?

এমনি। আমি এমনই করি। ট্রেনে, লঞ্চে, বাসে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও নেমে যাই। কিছুদিন সে জায়গা দেখি। আবার অন্য কোথাও চলে যাই।

আজব মানুষ! এমন মানুষ দেখিনি।

তন্ময় ওর পিঠে হাত রেখে বলে, আবার তোমার সঙ্গে কথা হবে।

ও স্টেশন মাস্টারের অফিসের দিকে এগিয়ে যায়। তৌফিক উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। বাইরে দাঁড়িয়েও তন্ময় স্পষ্ট তার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে। সেজন্য সে স্টেশন মাস্টারের কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

তৌফিক বলে যাচ্ছে, কী বললেন, ট্রেন আটকে গেছে! আমি তো আমার স্টেশন থেকে ট্রেনটা ঠিকঠাক মতো পার করে দিয়েছি। ওহ হো, লাইনে সমস্যা? ঠিক আছে দেখি এদিক থেকে কী করা যায়।

কথা শেষ হয়ে গেছে, তন্ময় মৃদু কণ্ঠে বলে, আসতে পারি স্যার?

তৌফিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখে অবাক হয়ে বলে, আসুন। আমার কাছে কোনো দরকার?

আপনার এই গাঁয়ে নদী আছে?

কেন থাকবে না! বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। ভূগোলে পড়েননি?

জি পড়েছি। বাবা-মা আমাকে খুব যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ছবি তুলব তো সেজন্য। নদী আমার একটি ভীষণ প্রিয় সাবজেক্ট।

নদী আছে কি-না খুঁজে দেখুন। অনেক ভালো সাবজেক্টও পেয়ে যেতে পারেন। এখানে কার কাছে এসেছেন? পরিচিত কেউ?

তন্ময় একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আমার নাম আশরাফুল হক তন্ময়। আপনি আমাকে তন্ময় করে ডাকবেন। আমি ভীষণ খুশি হবো।

খুশি! তৌফিক ভ্রু কুঁচকায়।

তন্ময় তড়িঘড়ি বলে, আমার বাবা নেই।

আমার মেয়েটিরও মা নেই।

দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হো-হো করে হাসে তৌফিক। বলে, এই না থাকার ভাবনায় আমি বেশ আনন্দ পাই।

আনন্দ! তন্ময় একটু ভেবে বলে, হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে আমিও আনন্দ পাই।

তুমিও আনন্দ পাও? বেশ ছেলে তো! আমার না হয় বয়স হয়েছে। চাওয়া-পাওয়ার আর কিছু নেই। যে কোনো সময় দম ফুরিয়ে যাবে। তোমার সামনে লম্বা জীবন।

ভাবলেই লম্বা হয়, না ভাবলে ছোট।

তৌফিক তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোথা থেকে উড়ে এসে ছেলেটি এমন টানটান কথা বলছে! জড়তা নেই, চঞ্চলতা নেই। গম্ভীর, বয়সি ভাবের চেহারা।

আমি আপনার একটা ছবি তুলি?

তৌফিক ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেয়। তন্ময় ছবি তোলে। তারপর ব্যাগ থেকে সাবিহা বানুর ছবি বের করে দেখিয়ে বলে, এটা আমার মায়ের। ছবি।

তৌফিক ছবিটা হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখে। স্মৃতি তাড়িত হয়। তন্ময়কে আপন ভেবে অন্তরঙ্গ স্বরে বলে, তোমার মায়ের সঙ্গে অনিমার মায়ের খুব সুন্দর মিল আছে তন্ময়।

কেমন মিল?

দু'জনের হাসিতে গালে টোল পড়ে।

হো-হো করে হাসে তন্ময়।

হাসছ যে?

মানুষের চেহারায় নতুন নতুন কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য আমি ছবি তুলি।

ঘরে বসে বাবার কথা খুব মনে হয় অনিমার

ঘরে বসে বাবার কথা খুব মনে হয় অনিমার। বাবাকে একা রেখে অন্য আর একটি সংসারে ঢোকা কি ওর পক্ষে সম্ভব হবে? পরক্ষণে রাজীব ওকে আচ্ছন্ন করে। ও একটি

সাদা কাগজে আঁকিবুকি কাটে। নিজেকেই বলে, বলেছিলে ফিরে আসবে। আসছ না কেন? আর কত দিন অপেক্ষা করব আমি? কত দিন ট্রেন এলে ছুটে যাব স্টেশনে।

ও কাগজটা ভাঁজ করে পাখি বানায়। সেটা ছুঁড়ে দেয় উপরে। বলে, জানি এ চিঠি কোনো দিন তোমার কাছে পৌঁছাবে না। ভীষণ মনে পড়ে, একদিন রাজীব আর ও একটি কাঠঠোকরা পাখির বাসা খুঁজতে অনেক দূরে গিয়েছিল। রাজীব ওকে হাত উঁচিয়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া অতিথি পাখির সারি দেখিয়েছিল। ও বাবার অফিসে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়।

তখন তৌফিক তন্ময়কে জিজ্ঞেস করে, তুমি আমাকে নদীর কথা জিজ্ঞেস করেছিলে কেন?

আমি প্রকৃতি ভালোবাসি। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য আছে, মানুষের মতো চেহারার রকমফের নেই। প্রকৃতির ভেতর সম্পর্ক তৈরি হয় না।

অন্যদিকে ঢাকায় এসে

অন্যদিকে ঢাকায় এসে মায়ের অসুস্থতায় আটকে পড়ে তন্ময়। সাবিহা বানু জরায়ু অপারেশনে এবং পরবর্তী জটিলতায় কয়েক মাস বিছানায় থাকে। একরকম যমে-মানুষে টানাটানি হয়। তন্ময় দূরে সরিয়ে রাখে নিজের প্রয়োজনীয় কথাটুকু। মা সুস্থ হলে আবার বাইরের টানে। ওর বেরিয়ে পড়ার তাড়না শুরু হয়। একদিন ভোরে মাকে চিঠি লেখে, মা, আমার পাগল করা মাগো, আমি আবার বের হচ্ছি। এবার একটু দূরেই যাব ভাবছি। তবে যেখানেই থাকি তুমি আমার চিঠি পাবে। তুমি ভালো করে সুস্থ হও। আমি ফিরে এলে আমার সঙ্গে ফুলমসি স্টেশনে যাবে। অনিমাকে নিয়ে আসব তোমার কাছে। তখন আমাদের জীবনের নতুন সূচনা হবে মাগো। তখন তোমার চেয়ে সুখী মানুষ এই পৃথিবীতে আর কে হবে! ইতি তোমার সোনালি ঈগল তন্ময়।

ঘুম ভেঙে ছেলের চিঠি পেয়ে সাবিহা বানু মৃদু হাসে। অসুখের পুরো সময়টা ও মায়ের যত্ন করেছে। খুব প্রয়োজন না হলে বিছানার পাশ থেকে নড়েনি। সাবিহা বানু ছেলের যত্নে ভীষণ খুশি। এমন ছেলে। পাওয়া ভাগ্য ছাড়া আর কি। বউ ঘরে এলে ও নিজেকে আটকাতে পারবে তো? সাবিহা বানু নিজেই চিন্তান্বিত হয়। ছেলেকে ভরসা করতে পারে না। মনে হয় তখনো ও মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যাবে।

মাকে চিঠি লিখে রেখে বেরিয়ে ফুল-বিক্রেতা ছোট সখিনার সঙ্গে ফুটপাথে দেখা হয় ওর। মেয়েটি পেছন থেকে দৌড়ে এসে ওর হাত ধরে।

আমার ছবি কই? দিলেন না তো?

ছবি তো আমার কাছেই আছে। আমি তো তোমাকে খুঁজতেই এই ফুটপাতে এসেছি। তুমি কেমন আছ সখিনা?

সখিনা ম্লান মুখে বলে, ভালা নাই। আমার মা মইরা গেছে।

তুমি আমার মায়ের কাছে থাকবে?

থাকুম। আমি একডা বাসায় থাইকা কাম করতে চাই।

গুড। তুমি একটা লক্ষ্মী মেয়ে।

ব্যাগ হাতড়ে সখিনার ফুল নিয়ে তোলা ছবিটা ওর হাতে দেয়। স্কুলের ইউনিফর্ম পরা ছবিটাও।

সখিনা ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, এইডা আমার ছবি না। আপনে এইডা ফেরত লন।

ও স্কুল ইউনিফর্ম পরা ছবিটা ফেরত দেয়। তন্ময় ছবিটা না নিয়ে বলে, আমার মায়ের কাছে থাকলে তোমার ছবিটা এমনই হবে। চলো। সখিনাকে নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে চিঠি লেখে মাকে, মা, আমার ধরিত্রী মা, আমি খুব ভালোভাবে জানি যে সখিনা তোমার

কাছে আশ্রয় পাবে। ওকে তুমি পড়ালেখার সুযোগ করে দেবে ওকে নিজের পায়ে। দাঁড়ানোর তৈরি হওয়ার সুযোগ। এটুকু করতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না মা। ওর দিকে তাকাও, দেখো ঘুটে কুড়ানি মায়ের সঙ্গে তোমার তন্ময়ের শৈশব খুঁজে পাও কি-না, মনে করো আমিই সখিনা, একদিন যাকে তুমি বুকে তুলে নিয়েছিলে। তোমার ঝোড়কাক তন্ময়।'

সখিনার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে সাবিহা বানু পাগল ছেলেটার জন্য ভীষণ মমতা অনুভব করে। পড়া হলে সখিনাকে বলে, পড়ালেখা শিখবি?

সখিনা ভয় পেয়ে যায়। ভীষণ ভয়ে মাথা নেড়ে বলে, না, পড়ালেহা শিখুম না। আমি আপনের কাম কইরা দিমু, আপনে আমারে ভাত-কাপড় দিবেন।

কিন্তু তোকে যে লেখাপড়া শেখাতে বলেছে আমার ছেলে।

ও খুশিতে লাফিয়ে উঠে বলে, সত্যি, তাইলে আমি লেখাপড়া শিখমু। স্কুলে যামু।

সাবিহা ওর মাথায় হাত রেখে বলে, তাই হবে। যা গোসল করে আয়।

সখিনার দৌড়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সাবিহার মনে হয়, তন্ময় ওকে নানাভাবে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করে, এটা যেমন নিজের দায়িত্ববোধ থেকে, তেমন মায়ের কথা ভেবেও, জানে মা এসব ভালোবাসে। দু'জনে মিলেই জগৎটা গড়তে চায়।

অনিমার সেদিন স্কুল বন্ধ। বাবা,অফিসে। ও এক টুকরো কাগজে লেখে। আর কত দিন অপেক্ষা কর? কবে আসবে তুমি! নাকি কোনো। দূর এলাকায় গিয়ে ভুলেই গেছ আমাকে। কাগজটা পাখির আকারে ভজ করে দেয়ালে টাঙানো ছোট একটি সুচের কাজ করা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখে। পাখির আকারে চিঠিতে ব্যাগটা ভরে উঠেছে। হঠাৎ ট্রেন

আসার শব্দে চমকে ওঠে। ছুটে আসে প্লাটফর্মে। মাসুম সবুজ পতাকাটা ভাঁজ করে এগিয়ে আসে।

আপা, আপনি বসেন। আমি দেখি।

না, আমি দেখব। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো।

অনিমা এগিয়ে গিয়ে ট্রেনের কামরায় উঁকি দেয়। ট্রেন চলে যায়। ট্রেনের শেষটুকু অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বলে, কী পাগলামি! তন্ময় এলে তো ও নিজেই ট্রেন থেকে নামবে। আমার খুঁজতে হবে কেন? মাসুম পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে, আপা বাড়ি চলেন। অনিমা বিরক্ত হয়ে বলে, বাড়িতে কেন যাব? বাড়িতে কে আছে? আমার তো বাড়ি ভালো লাগে না।

মাসুম মনে মনে বলে, ভালো তো লাগবেই না! তন্ময় ভাইয়ের মতো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে তার না থাকাটা যে কী কষ্টের তা আমিও বুঝি। আপনি তো আরো বেশি বুঝবেন আপা।

অনিমা বাড়ি যাবে না ভেবেই বাবার অফিস ঘরের দিকে যায়। শুনতে পায় তৌফিক ফোনে জোরে জোরে কথা বলছে তার চাচাতো ভাই সাদেকের সঙ্গে। অনিমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাবার প্রতিটি শব্দ যেন এক এক খণ্ড পাথরের টুকরোর মতো ওর বুকের ওপর চেপে বসে।

সাদেক তুমি কেমন আছ ভাই? না, আমার শরীর বেশি ভালো না। কেবলই মনে হয় কখন আছি, কখন নেই। আমি না থাকলে মেয়েটার আর কে থাকবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি তো জানি তোমরা আমার মেয়েটাকে তোমাদের কাছে নেয়ার অপেক্ষায় আছ। তারেক এখন কি ঢাকায়? ভালো চাকরি করছে? শুনে খুব খুশি লাগছে। যাহোক, তোমরা একবার আসো। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার জন্য কথাবার্তা বলি।

অনিমার আর বাবার অফিসে ঢোকা হয় না। ও বাড়ি ফিরতে থাকে। যেন প্রবল ঝড় মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছে, ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, এত অন্ধকার নেমেছে পথে। ওর পথ আটকায় তুলি আর কলি।

আপা সেই ভাইজান আমাদের ছবিগুলো দ্যায় নাই?

তোমাদের ভাইজান তো এখনো ফিরেনি। যখন ফিরবে তখন ঠিকই তোমাদের ছবিগুলো আনবে।

এতদিনে যহন আসে নাই, আর বোধঅয় আসবে না। শহরের মানুষগুলোই এমুন। যাই আপা।

অনিমার মনে হয় ঝড় থেমে গেছে। থমথম করছে চারদিক। ও বুকভরা শূন্যতা নিয়ে বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ায়। তালা খোলে। স্টেশনের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি আমাকে চিঠি লেখো না কেন তন্ময়?

তন্ময় এখন লন্ডনে।

হঠাৎ করেই এসে পড়েছে, অনিমাকেও বলার সুযোগ হয়নি। সাবিহা বানুই ছেলেকে ফটোগ্রাফিতে একটি কোর্স করানোর জন্য নিজের উদ্যোগেই ব্যবস্থা করেছে। ছয় মাসের কোর্স। বলেছে, দেখতে দেখতে কেটে যাবে বাবা। তাছাড়া ইচ্ছে করলে তুই আরো ছয় মাস বেশি থেকেও আসতে পারিস। তন্ময় মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এত দিন আমাকে না দেখে থাকতে পারবে তুমি?

দেশে থাকলেই কি তুই আমার চোখের সামনে সারাক্ষণ থাকিস? ঘুরে বেড়াস না?

বেড়াই তো। ঘুরতে না পারলে আমার দম আটকে আসে। আমি তোমার ভবঘুরে ছেলে।

হিথ্রো বিমানবন্দরে সব কাজ চুকিয়ে বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস নাক-মুখ ছুঁয়ে যায়। হালকা তুষার ঝরে পড়ছে। বেশ লাগছে ওর। প্রথমে টাকা ভাঙায়, তারপরে মায়ের সঙ্গে কথা বলে। ফোন বুথের সামনে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, অনিমার জন্য বুকের ভিতর টান ওঠে, কিন্তু অনিমাকে ফোনে যোগাযোগ করা যাবে না। ও একটি চমৎকার রেল স্টেশনে বাবার সঙ্গে থাকে, বাবা স্টেশন মাস্টার, যেখানে হুইসেল বাজিয়ে দারুণ শব্দ করে রেলগাড়ি ঢোকে, সেই শব্দের সঙ্গে ও নিজের বুকের ভালোবাসার ধ্বনি এক করেছে, অনিমা এখন ওর সবচেয়ে প্রিয় নারী, যার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলবে, দাও তোমার হাতটা ধরি। আমাদের যাত্রা শুরু। ভেব না তুমি আমার প্রভু, আমরা ভালোবাসার কাঠগড়ায় দুজনে একসঙ্গে দাঁড়াব। জানবে, জীবনের সত্যে নারী-পুরুষের অবস্থানগত ভেদ নেই।

তন্ময় মৃদু হেসে নিজেকে ফোন বুথের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে আনতে বলে, তোমার কথাই ঠিক অনিমা। আমি এখন থেকে মানবজীবনের সমতার জায়গাগুলো খুঁজব। আর প্রতিদিন একটি করে চিঠি লিখব, যেমন মাকে লিখি, আমার ভবঘুরে জীবনে এতদিন মা ছিল আমার চিঠির যোগসূত্র, এখন যুক্ত হলে তুমি। আমি তোমাকে রোজ। একটি করে চিঠি লিখব অনিমা।

ছোট একটা সুটকেস ছিল সঙ্গে ইচ্ছে করে বেশি বোঝা টানেনি, ও মাকে বলে দিয়েছিল যে পরিচিত কারো কাছে আমি যাব না, আমি এখানে যেমন ঘুরে বেড়ানো দিন কাটাই তেমন করেই বিদেশেও কাটাব মা। ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিচ্ছ, দাও, কিন্তু যোগাযোগ করতে বলো না।

যদি কোনো বিপদে-আপদে পড়িস?

আচ্ছা, তেমন হলে যোগাযোগ করব, শুধু তোমাকে খুশি করার জন্য মা।

দেখো ছেলের কথা!

সাবিহা বানু ছেলের মাথা বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেজন্য তন্ময়ের সঙ্গে লটবহর নেই, দেশ থেকে নানা মানুষের জন্য নানা কিছু আনার ঝক্কি-ঝামেলা নেই। নিঝঞ্ঝাট অনুভবে তন্ময় খুব ফুর্তি অনুভব করে। আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন থেকে রেলে উঠে ও বাইরে তাকালে জীবনের জলছবি ওকে মায়ার বাঁধনে টানে। কী অপূর্ব লাগছে চারদিক! বাড়িঘর তেমন নেই, এখন পর্যন্ত দিগন্ত-বিথারি প্রান্তরজুড়ে অজস্র রঙের বিন্যাস, মিষ্টি রোদ, নীলাকাশের প্রান্তছোঁয়া নেমে আসার সঙ্গে নিজের দেশের সাদৃশ্য পেয়ে ও ভাবে, দিনগুলো ভালোই কেটে যাবে। অনিমা আমি তোমার কাছে ফিরে আসছি।

প্রথম দিনই ডরমিটরিতে পরিচয় হয় নীলিমার সঙ্গে, ও বাংলাদেশের মেয়ে। চট্টগ্রামে বাড়ি। বাবা শিল্পপতি, স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ায় পরে পড়তে এসেছে। বলেছে, দেশে না-ও ফিরতে পারে। কোর্স শেষ হলে ফেরার কথা ভাববে।

তনায় পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের সম্পর্কে এত কথা বলেনি। আগ বাড়িয়ে এত কিছু বলে দিলেই কি একজন মানুষের পরিচয়ের পর্ব শেষ হয়ে যায়? কত খোসা যে ছিলতে হয় তার কি শেষ আছে! তন্ময় গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। নীলিমা খানিকটা অবাক হয়। ভাবে, ছেলেটার সৌজন্য জ্ঞান কম, নাকি ও নারীর সঙ্গে কথা বলতে বেশি পছন্দ করে না? নীলিমা দ্বিধা নিয়ে ক্যান্টিনে খেতে যায়।

ওদের ক্লাস শুরু হয়েছে। নভেম্বর মাস। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। ছেলেমেয়েরা বলাবলি করছে যে লন্ডনে নভেম্বর মাস খুব বাজে সময়। এ সময়ে আবহাওয়া বুঝে ওঠা দায়, হাড়-কাঁপানো শীতের সঙ্গে এই বৃষ্টি এই রোদ। প্রত্যেকেরই মেজাজ খারাপ। এমন আবহাওয়া সব আনন্দ মাটি করে দেয়। ক্লাসের বাইরে ডরমিটরির টানা বারান্দায় মাঝে মাঝে নীলিমার সঙ্গে দেখা হয়, হাই-হ্যালো হয়, এ পর্যন্তই। বড়জোর। আবহাওয়া নিয়ে কথা। ও তেতেমেতে বলে, দেখেছ কাণ্ড, এখানকার আকাশ দেখে মনে হচ্ছে কালো মেঘ এই আকাশের স্থায়ী ঠিকানা। দেশে বসে বর্ষার কালো মেঘ দেখে উফুল্ল হতাম, এখানে দেখতে পাচ্ছি তার উল্টো। এই আকাশ মেজাজ ঠিক রাখতে দেয় না। তারপরও ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি লেগে থাকে। যত্তসব।

আমার কিন্তু ভালোই লাগছে। নতুন কিছু যদি দেখতে না পাব তাহলে এলাম কেন? এখানে এসে যদি সেই দেশের ছবি বা আবহাওয়া পাব তাহলে–

বুঝেছি, যা কিছু উল্টাপাল্টা সেটাতেই তোমার আনন্দ। প্রথম দিনই। টের পেয়েছি যে তুমি একটা চিজ!

বাপস, চিজ! তুমি তো বেশ স্মার্ট মেয়ে। ঠাসঠাস কথা বলতে পারো। আরে বাব্বা।

হয়েছে রাখো, গেলাম।

কোথায়?

শুড়িখানায়। যাবে?

না, আমি ম্যাথুর ওখানে যাব। ও একটা দারুণ হিপ্পি। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।

ওর ওখানে আমাকে একদিন নিয়ে যেও তন্ময়। নেবে তো?

হ্যাঁ, যেও একদিন। আপাতত গুঁড়িখানা সেরে এসো।

নীলিমা চলে যায়। তন্ময় নিজের ঘরে আসে। বাইরে বেরুলে বৃষ্টির ছাঁট বরফের ছুরির মতো এসে বেঁধে। মা ওকে শীতের পোশাক কিছুই দেয়নি, বলেছিল ওখানে গিয়ে কিনে নিবি, আসার সময় ফেলে আসবি।

সোনা মা আমার, দারুণ আইডিয়া তোমার।

আইডিয়া হবে না। আমার ছেলেকে তো আমি চিনি। বোঝা যত কম হবে ওর সুখ তত আকাশছোঁয়া হবে। ছেলেকেই যদি না চিনব তো কেমন মা আমি!

এখানে এসে ও ওভারকোট, সোয়েটার, মাফলার, মোজা, উলের টুপি সব কিনেছে ক্যামডেন থেকে। এসব কিনতে গিয়েই তো ওর ম্যাথুর সঙ্গে পরিচয় হয়। ক্যামডেন টাউন বেশ মজার জায়গা। শনি আর রবিবারে এখানে অস্থায়ী দোকানের খোলাবাজার বসে, এটা হিপ্পিদের রাজত্ব–দোকানের মালিক বেশিরভাগ ওরাই। কত বিচিত্র ধরনের পোশাকই যে ওরা পরে। জিনসের প্যান্ট বিভিন্ন জায়গায় কেটে রাখে, কখনো টেনে হেঁড়ে, সুতো বেরিয়ে থাকে, সঙ্গে টি-শার্টও ঘেঁড়ার ফ্যাশন। তন্ময়ের মনে হয় ওর সঙ্গে অনিমা থাকলে হেসে গড়িয়ে পড়ত–বলত, তন্ময় আমি তোমাকে এই পোশাকে দেখতে চাই, বুঝব তুমি কতটা অচেনা হয়ে যেতে পারো আমার কাছে।

ও নিজেকেই বলে, না আমি তোমার কাছে অচেনা হয়ে যেতে চাই না। আমি তোমার চেনা মানুষ হয়ে থাকতে চাই কুট্টি সোনা।

লন্ডনে তো কত ধরনের মানুষ থাকে, কত দেশের ছেলেমেয়ে এখানকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। ওদের মতো পারিপাট্য হিপ্পিদের নেই। নিজেকে অবহেলা করে ওরা আনন্দ পায়, মনে হয় অবহেলাই ওদের ভূষণ। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আনরুলি হয়ে যায়, তখন ওদেরকে ভয় লাগে। মারমুখী ছেলেমেয়েগুলো অনেক সময় ক্ষিপ্ত হলে আক্রমণ করে। একথা শুনে নীলিমা বলেছিল, মারপিট করতে আমার খারাপ লাগে না। এ ব্যাপারে আমি পিছিয়ে থাকার পাত্র নই।

পাত্র বলছ কেন, ব্যাকরণের ভুল, তুমি পিছিয়ে থাকার পাত্রী নও।

এখানেই তোমার সঙ্গে আমার ভাবনার তফাত। তুমি নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি বোঝ না।

ঠিক আছে তুমি বুঝিয়ে দিও। আমি বুঝতেই চাই, যাতে অনিমা এ বিষয়ে আমাকে ঘায়েল করতে না পারে। তোমাকে দেখেই বুঝেছি সংসার একটি কঠিন ক্ষেত্র।

হো-হো করে হাসে নীলিমা। হাসতে হাসতে বলে, তোমাকে আমার কথা শোনাব। বুঝবে কীভাবে লড়াইটা হয়। তোমার সঙ্গে আজ আমি ক্যামডেন টাউনে যাব। আমার কিছু কেনাকাটা আছে। যাবে নাকি অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়বে?

তোমার খোঁচা হজম করতে করতে আমি অস্থির। একটুও ছেড়ে কথা বলো না। চলো যাই।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ক্যামডেন টাউনে আসে। ওখানে একটি লেক আছে, লেককে যুক্ত করে আছে একটি সেতু। সেতুর ওপারে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আছে ক্যামডেন রোডের দুপাশে খোলাবাজার। নীলিমার ছেলেমানুষি উচ্ছাস উছলে পড়ে নানা জিনিসকে নিয়ে। সারি সারি লোহার স্ট্যান্ডে হ্যাঙ্গার টাঙিয়ে পুরনো কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শত শত জিনসের প্যান্ট আর শার্ট। নীলিমা তিন-চারটে প্যান্ট-শার্ট কেনে। শার্টের রঙ বাছাই করে দিতে হয় তন্ময়কে। নীলিমা হাসতে হাসতে বলে, আমাদের বৈশাখী মেলার মতো মনে হচ্ছে।

বৈশাখী মেলা হবে কেন? বঙ্গবাজারের মতো লাগছে।

মোটেই না। বঙ্গবাজারের দোকানগুলো খোলা জায়গায় নয়।

তা ঠিক বলেছ। সামনে গেলে বৈশাখী মেলার ক্যারেক্টারটা আরো স্পষ্ট হবে।

দুজন সামনে এগিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় নীলিমা তন্ময়ের হাত চেপে ধরে। ভিড় ঠেলে এগুতে হচ্ছে দুজনকে। নীলিমা হাঁটতে হাঁটতে বলে, ঢাকায় এমন ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হলে কত যে পুঁতো খেতে হতো। এখানকার ভিড় বেশ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে মানুষের শরীরের উষ্ণতার চমৎকার গন্ধ আছে। ভিড় ঠেলে দোকানগুলো দেখতে বেশ লাগছে। দেখো দেখো কাপড় দিয়ে কী সুন্দর খাপড়া তৈরি করা হয়েছে। সেখানে টেবিল পেতে নানারকম জিনিস রাখা হয়েছে।

এখানে এলে আমি উইন্ড চাইম দেখতে ভালোবাসি। দেখো বাতাসে কী সুন্দর টুংটাং বাজছে।

তুমি কি তোমার রুমের জন্য একটা কিনেছ?

না, কেনার কথা আমার মনে হয়নি, বরং এখানে এসে ওই শব্দটা শুনতে আমার ভালো লাগে। ঘরে থাকলে এখানে এসে শোনার আগ্রহ কমে যাবে।

আমি একটা কিনব।

কিনে ফেল। সারাক্ষণই শুনতে পারবে।

নীলিমা একটা উইন্ড চাইম কিনে বলে, এটা হাতে নিয়ে আমি দাঁড়াচ্ছি। তুমি এই ভিড়সহ আমার একটা ছবি তোলো তন্ময়।

তন্ময় ছবি তুলে দিয়ে বলে, একটা জিনিস আমার খুব প্রিয়। দেখো মাঝখানে সরু পথ, দু'পাশের দোকানগুলো একদম মুখোমুখি। যেখানেই যাই না কেন টুংটাং শব্দ আমার কানে পৌঁছে। এ গভীর আনন্দ আমি উপভোগ করি। আমার এখন মায়ের কথা মনে পড়ে।

অনিমার কথা মনে পড়ে না?

এই প্রসঙ্গে মাকেই মনে পড়ে বেশি। অন্য প্রসঙ্গে অনিমা আমার স্মৃতিতে আসে।

বাহ তুমি বেশ ব্যালান্স করতে পারো।

এটা আবেগের ব্যাপার নীলিমা, ব্যালান্সের ব্যাপার নয়। মাঝে মাঝে তোমার কথা শুনলে আমার খুব রাগ হয়।

ইচ্ছে করে আমাকে ছুড়ে ফেলে দিতে?

হ্যাঁ, তাও হয়।

তাহলে লেকের জলে ফেলে দাও।

একদিন কাজটা করেও ফেলতে পারি, কে জানে।

নীলিমা হো হো করে হাসতে হাসতে বলে, তুমি খুব মজার ছেলে। অনিমা তোমাকে নিয়ে সুখে সংসার করতে পারবে।

হয়েছে আর জ্যোতিষীর মতো ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে না। ওই দেখো সামনে কত জিনিস মোমবাতি, ফটোফ্রেম, খেলনা, চাদর বালিশের কভার, কাঠের চেয়ার, টেবিল, হাঁড়ি-পাতিল, চামচ–

হয়েছে থামো। ওসব কেনার আমার ইচ্ছা নেই। তোমার ম্যাথু কই? ও নিজেও কি এইসব হিপ্পির মতো সাদা ধুতি আর ভারতীয় বুটিকের ঢোলা পাঞ্জাবি পরেছে? এক একটাকে কেমন ফানি লাগছে না–

আমি মজা পাই।

ছবি তোলোনি?

অনেক ছবি তুলেছি। দেশে গিয়ে দারুণ একটা এক্সিবিশন করব।

আছো ধান্দায়।

এটাকে তুমি ধান্দা বলছ? ফটোগ্রাফি আমার ক্রিয়েটিভ কাজ। বুঝতে পারছি ক্লাসগুলো তুমি ঠিকমতো ফলো করো না।

ঠিকই ধরেছ, টিচারদের কথা শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

আমার জীবনের কথা আমি তোমাকে শোনাব তন্ময়। তাহলে হয়তো খানিকটুকু হালকা হবো। তুমি শুনবে তন্ময়?

শুনব, একশবার শুনব। এখানেই তো তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, অন্যরা তো ক্লাসের বন্ধু, কিংবা যাওয়া-আসার পথের সাথী।

থ্যাঙ্কু তন্ময়। চলো না ম্যাথুর কাছে যাই।

তন্ময় ভিড় ঠেলে নীলিমাকে ম্যাথুর কাছে নিয়ে আসে। হিপ্পিদের বিভিন্ন দোকানে ভারতীয় জিনিসে ভরা, কিংবা আফ্রিকার কোনো কোনো দেশের কিন্তু ম্যাথু বোধহয় চীনের ভক্ত, ওর দোকান চীনা জিনিসে ভরা। এছাড়াও নিজে বিভিন্ন ধরনের লকেট বানায়। তন্ময় আর নীলিমা গিয়েও দেখল যে ম্যাথু একমনে লকেট বানাচ্ছে। দুজনে প্রথমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, ম্যাথুর মনোযোগ নষ্ট করতে চায় না–ওর গ্যাট্টাগোট্টা শরীর, রঙ করা চুল, চেহারা খানিকটা ক্লিষ্ট, যেন অভাব তাকে ছাড়ে না, কিংবা যে রোজগার করে মদ খেয়ে বা জুয়া খেলে উড়িয়ে দেয়। জামাটা মলিন এবং ছেড়া, ইচ্ছা করে ছিড়েছে তা নয়। পুরনো হাওয়ার কারণেই ছিড়েছে, তারপরও ম্যাথু হিপ্পি। ওর পুরো অবয়বে এলোমেলো জীবনের ছাপ সুস্পষ্ট। শরীরের পেশিতে যৌবনের উন্মত্ততা আছে, চেহারার সঙ্গে যার অনেক ফারাক। নীলিমা ফিসফিস করে বলে, লোকটা বেশ হ্যান্ডসাম এবং অদ্ভুত।

তাহলে বোঝ আমি কেন ওকে পছন্দ করি।

তোমার পছন্দ আর আমার পছন্দ একরকম হবে না।

সে তো অবশ্যই, তুমি তো নারী, তুমি ওর বাহুবন্ধনে ধরা দিতে চাইতে পারো।

তুমিও পারো। গে-রা কী করে জানো না!

তখন নীলিমার হাতে কষে একটা চাপ দিয়ে বলে, এখানেই তোমার বৈশিষ্ট্য। জুতসই জবাব দিতে তোমার জুড়ি নেই নীলিমা।

তখন ম্যাথুজ কুঁচকে চোখ তোলে। তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে।

তন্ময় নীলিমাকে দেখিয়ে বলে, আমার বন্ধু নীলিমা।

ম্যাথু ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নাইস টু মিট ইউ।

নীলিমা টের পায় ম্যাথু ওর হাতে বেশ জোরে চাপ দিয়েছে। চাপটা শুধুই হ্যান্ডশেকের নয়, আর একটু অন্যকরম। ও সরাসরি ম্যাথুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, সে গোঁফের নিচে ম্যাথুর ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা এবং সঙ্গে সঙ্গে ও এমনটা ভাব দেখায় যেন কাস্টমার রিসিভ করছে। নীলিমা বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য কথা বাড়ায় না, এমনকি তন্ময়ের কাছেও বিষয়টি এড়িয়ে যায়। ম্যাথু চেয়ারে বসতে বসতে নীলিমাকে বলে, এগুলো সব আমার নিজের হাতে বানানো।

খুব সুন্দর! নীলিমার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস।

লকেটগুলো নানা আকৃতির স্ফটিকের পাত। একটিও আকারে এক ইঞ্চির বেশি নয়। গাঢ় উজ্জ্বল রঙ যেন ছিটকে বেরুচ্ছে। গাঢ় গোলাপি, সমুদ্র নীল, মিশমিশে কালো, অনন্য বেগুনি, না বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। ছোট ছোট পাথরের ওপর ম্যাথু নানা ভঙ্গির পরী, টিকটিকি, ফুল, ব্যাঙ, পাখি ইত্যাদি বসিয়ে দিয়েছে। এগুলো রুপোর তৈরি, আকারে এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ। একটা গোল পাথরের ওপর পরী বসানো লকেটটা তন্ময়ের খুব পছন্দ হয়। পরীর পা জোড়া বাঁকানো, বুকের কাছে হাত জড়ো করা, ডানা দুটো দেখে মনে হয় আকাশে বুঝি উড়ে যাচ্ছে। তন্ময় নীলিমাকে দেখিয়ে বলে, এই লকেটটা সুন্দর না? অনিমার জন্য কিনতে চাই।

হ্যাঁ, খুবই সুন্দর, কিনো ফেল।

তন্ময় নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, আমি জানি ওকে খুব মানাবে, ও আমার শ্যামল পরী।

হা-হা করে হাসে নীলিমা। বলে, অনিমা তোমাকে বেশ পাগল বানিয়ে ফেলেছে।

নীলিমার কথা শুনে তন্ময় বলে,মায়ের কাছে শুনেছি কামরুপ। কামাখ্যায় নাকি পরীরা থাকে, ওরা পৃথিবীতে এসে বেছে বেছে সুন্দর ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়। তারপর ওদেরকে পাগল বানিয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। বলো তো কেমন অদ্ভুত কাণ্ড!

কিন্তু ছেলেরা যদি পাগল হয়েই ফিরবে তবে পরীদের কথা বলে কী করে? সমাজটাই এমন। পুরুষের তৈরি তো, নিজেদের ইচ্ছেমতো গল্প বানায়।

শুরু হয়ে গেল তোমার নারী-পুরুষ আলোচনা।

শুরু তো হবেই, তোমাদের অত্যাচারে যে আমরা অতিষ্ঠ। শোনো, একটা ছেলে পাগল হলে সেটা অসুস্থতা, আর একটি মেয়ে পাগল হলে তাকে ভূত বলা হয়। চিন্তা করো পরী আর ভূতের পার্থক্য। ছেলেরা ভালোবাসলে মেয়েটি হয় পরী, আর মেয়েটির কোনো দোষ পেলে তাকে বানায় ভূত। গায়ে ভূত ছাড়ানোর পদ্ধতি দেখেছ? কী বীভৎস। যে অত্যাচার মেয়েটিকে সহ্য করতে হয় তার কণামাত্র ছেলেটিকে করতে হয় না।

ম্যাথু হাসতে হাসতে বলে, তোমরা কি কোনো ইস্যুতে ডিবেট করছ?

নীলিমা গলা ভারী করে বলে, করছি। জেন্ডার ইস্যুতে ডিবেট।

জেন্ডার ইস্যু আমি বুঝি না। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করিনি।

ঠিক আছে, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

তুমি একটাও লকেট নেবে না?

নেব, তবে আর একদিন আসব, একা। তন্ময় আমার সঙ্গে আসবে না।

খুব ভালো, ম্যাথু হাসতে হাসতে মাথা ঝাকায়। ওর রঙিন চুলের গুচ্ছ এলোমেলো হয়ে যায়, দারিদ্র সত্ত্বেও ওকে বেশ সুখী মানুষই মনে হয়। ও আবার নিজের কাজে মন দেয়।

দুজনে অন্যদিকে যেতে যেতে বলে, একটা জিনিস খেয়াল করেছ যে আমাদের দেশের দোকানদারের মতো ওরা ডাকাডাকি করে না। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

নিরক্ষর, প্রায়-নিরক্ষর, তারপর গরিব দেশের মানুষেরা পরিশীলিত হতে সময় লাগবে নীলিমা।

যাক এসব। চলো তোমাকে নান্দোস চিকেন খাওয়াই। খেয়েছ?

না, এই প্রথম তোমার কাছে নাম শুনলাম।

এটা একটি পর্তুগিজ রেস্টুরেন্ট। চিকেনের জন্য বিখ্যাত। অসম্ভব ঝাল মুরগি ভাজা হয়, পেরিপেরি সস দিয়ে খেতে হয়। ঝাল খেতে পারবে তো?

খুব পারব। তুমি পারলে আমি পারব না কেন?

ও আচ্ছা, প্রতিযোগিতা ভাবছ। ঠিক আছে ধরলাম বাজি।

দুজনে নান্দোসে ঢোকে। দুজনের ক্ষিদে পেয়েছে। নীলিমা ঝাল পেরিপেরি মুরগির অর্ডার দেয়। যে ছেলেটি অর্ডার নিচ্ছিল দুবার জিজ্ঞেস করে সবচেয়ে ঝালটাই চাচ্ছে কি-না। নীলিমা বিরক্তির ভাব দেখিয়ে মাথা ঝাকায়। টেবিলে বসতে বসতে নীলিমা বলে, কত আর ঝাল দেবে, দেখিই না। সঙ্গে তো ভাত আছে। জিহবা বেশি পুড়লে কোক খেতে থাকব। কী বলো? তন্ময় কথা বলে না। বাড়িতে ওর মা মাঝে মাঝে ঝাল দিয়ে রান্না করে। বেশি ঝালের তরকারি খাওয়ার অভ্যেস ওর নেই। সেজন্য ভেতরে ভেতরে তন্ময় একটু দমে থাকে। বেশ সময় নিয়েই ওরা খাবার সার্ভ করে। চমৎকার ভাজা

মুরগি, ভাতের রঙ হলুদ, ঘ্রাণে জিভে জল আসে। কিন্তু এক টুকরো মুখে দিতেই দুজনের নাক-চোখ দিয়ে দরদরিয়ে পানি ঝরে। পর্তুগিজ ছেলেটা কাছাকাছি কোথাও ছিল, দ্রুত এসে মিষ্টি জাতীয় কিছু একটা সামনে দিয়ে চলে যায়। নীলিমাও ঝালে কাবু হয়ে গেছে, এত ঝাল ও আন্দাজ করতে পারেনি। কোক আর পর্তুগিজ পিঠা খেয়ে জিহ্বা সামলায়। তন্ময় সামলে নেয় নিজেকে, কিন্তু দেখতে পায় নীলিমার চোখের পানি আর ফুরাচ্ছে না। তন্ময়ের মনে হয় নীলিমা কাঁদছে, কিন্তু কেন? ও প্রবল অস্বস্তিতে নীলিমার বাম হাতের ওপর চাপ দিয়ে বলে, তুমি কি কাঁদছ?

এই মুহূর্তে কাঁদতেই আমার ভালো লাগছে তন্ময়। যে নীলিমাকে তুমি দেখছ এই নীলিমার বুকের ভেতরে হাজারটা নীলিমা আছে। তার এক একটি চেহারা আছে। আমি এখন অন্য চেহারায় ভীষণ আক্রান্ত। আমাকে আর প্রশ্ন করো না। কাঁদতে দাও।

তন্ময় দেখতে পায় পুরোটা সময় নীলিমা চোখের জল মুছতে মুছতেই ঝাল চিকেন আর ভাত খায়। এক সময় অস্ফুট স্বরে বলে, ওই পর্তুগিজ ছেলেটি যত্ন করে যে ছোট্ট খাবারটুকু দিয়ে গেছে, তা আমাকে খুব স্পর্শ করেছে। এমন ঘোট ঘোট ভালোবাসার আমি খুব কাঙাল। একজন মানুষের সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে এর বিপরীত আচরণ পেয়েছি বলে সেই রক্তক্ষরণ আমাকে মরমে মারে। ছোট ভালোবাসায় আমি কাঁদতে ভালোবাসি।

অনেক রাতে অনিমাকে চিঠি লেখে তন্ময়।

প্রিয় অনিমা, প্রিয়তম নারী আমার, ব্যস্ত কদিন কাটানোর পরে তোমাকে লিখতে বসেছি। ব্যস্তত্ম শুধু নিয়মিত কাজের নয়, ভিন্ন দেশের অচেনা পরিবেশে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেয়ার চেষ্টাও। আসার আগে তোমাকে বলে আসা হয়নি, মা আমার এখানে আসার আয়োজন ঠিক করে রেখেছিল বলে, আমি আর ফুরসত পাইনি বুড়ি ছোঁয়ার মতো তোমাকে এক নজর ছুঁয়ে আসার। জানি তোমার মন খারাপ হলেও, রাগ করবে

না, তুমি আমার অপেক্ষায় দিন গুনবে। এই মুহূর্তে আমাদের জীবনে অপেক্ষাই সত্যি। এটিও আমার ভবঘুরে জীবনের একটি অংশ।

আমার সঙ্গে একই কোর্সে পড়তে এসেছে নীলিমা–স্বামীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বাবার পয়সা আছে, ফটোগ্রাফির নেশা তেমন আছে বলে মনে হয় না, সময় কাটানোই লক্ষ্য। আমার কাছে নিজের জীবনের কথা বলেছে। নীলিমা বেশ স্ট্রং মেয়ে। নীলিমা আমাকে ওর কথা যেভাবে বলেছে আমি অনেকটা ওর জবানিতেই তোমাকে জানাতে চাই অনিমা, হয়তো একটু হেরফের হতে পারে ভাষায়, কিন্তু মূল বিষয়টা আমি বুঝেই লিখছি। নীলিমার কথা শুনতে শুনতে নিজের দিকে তাকিয়েছি, নিজেদের সংসারের কথা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে, তোমাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে পারব তো, নাকি পুরুষ হিসেবে নিজের আধিপত্য দেখাতে চাইব, যেটা নীলিমার স্বামী করেছে! এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না, কারণ সংসারে তো এখনো ঢকিনি, কিন্তু প্রভু হওয়ার বাসনা নিজের ভেতর কতটা সেই দাঁড়িপাল্লায় এখন পর্যন্ত নিজের ওজন ভারী দেখছি না অনিমা, ট্র, একটুও মিথ্যে না। ভরসা করতে পারছি নিজেকে, কারণ নীলিমার একটি তীব্র কথা প্রকটভাবে আমার ভেতর গেঁথে আছে। ও বলেছে, গত পঁচিশ বছর ধরে জেন্ডার বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে নারী-পুরুষদের সমতার প্রশ্নে মানুষ' করা হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষিত ছেলেগুলোকে মানুষ করবে কে? সামাজিক ধারণায় এবং শ্রেণীগত অবস্থানে আমি তো শিক্ষিত এবং আরো একটু বেশিও নিশ্চয়, আমিও কি মানুষ হতে পেরেছি! লন্ডনের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে এই প্রশ্নের সুযোগটি রেখেছি অনিমা।

নীলিমা কী বলেছে শোনো, আমার চৌদ্দ মাসের সংসার জীবনে আমি আমার স্বামীর কাছে অর্থ কিংবা বিলাস চাইনি, চেয়েছি নারী হিসেবে পুরুষের চোখে আমার মর্যাদা-সম্মান–এককথায়, সমতা–বলেছি, তুমি আর আমি সমান। ও মানতে পারেনি, ও আমার ওপর প্রভুত্ব ফলিয়েছে। ও তো পুরুষ হয়ে জন্মেছে, প্রভুগিরি করার অধিকার নিয়ে–সুতরাং এই জাতাকলের নিয়মে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখবে সে। আমার অফিসে সন্ধ্যায় মিটিং থাকলে রেগে যেত ও ঘরে ফিরলে হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো, তাও আবার এমন সব প্রশ্ন যে শুনলে ঘেন্নায় মাথায় রক্তের ঘূর্ণি উঠত; অথচ ও নিজে রাত বারোটায় ফিরলে জিজ্ঞেস করা যেত না যে কোথায় ছিল। সংসারে সব

সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার ছিল ওর, আমার না। গানের কোন ক্যাসেটটা শুনব সেটাও ওর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করত, তারপরও চালিয়েছিলাম অনেক দিন। কিন্তু যেদিন ঝগড়ার মুহূর্তে রাতদুপুরে ঘর থেকে বের করে দরজা লাগিয়ে দিল সেদিনই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আর নয়, অনেক হয়েছে। আমিও যে মানুষ, আমারও যে ভালোমন্দ বোধ আছে, চিন্তা আছে–ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে সেটা আমি ওকে বোঝাতে পারিনি। এই ব্যর্থতা স্বীকার করে সংসারের ইতি টানার জন্য আমি তৈরি হয়ে গেলাম। বুঝলাম সংসার ভাঙার জন্য অনেক সময় বিশাল কোনো কারণ লাগে না, ছোট ছোট ঘটনার সমষ্টি এত মৌলিক প্রশ্নের জন্ম দেয় যে তার ওপর আর অন্য কথা চলে না। এই বিষয়টুকু বুঝেও কোনো নারী সিদ্ধান্তে নেয়। ছয় মাসে, কেউ পাঁচ বছরে, কেউ সিদ্ধান্ত নেয়ই না, একটি স্বাভাবিক মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন কাটায়। স্বামীর সঙ্গে মনের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েও দিন কাটায় সামাজিকতার নামে, সন্তানদের দায়ে। আমি চাইনি এসব দায় টেনে দিন কাটাতে। যদি কোনো ভালো মানুষ খুঁজে পাই তবে আবার সংসার করব, আমি ঘর চাই, সন্তান চাই–এই সম্পর্কের আনন্দ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাই না। নীলিমার কথা আজ এতটুকু, আরো কথা হলে পরে লিখব। অনেক ভালোবাসা, তোমার তন্ময়।

খামটায় গাম লাগিয়ে স্কুলের ব্যাগের ভেতর রাখে, কাল পোস্ট করবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, রাত আড়াইটা। সকালে ক্লাস আছে। আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে যাওয়ার চেয়ে ও বাসে যেতে ভালোবাসে, কারণ নিচ দিয়ে গেলে শহরটা দেখা হয় না, শহর দেখার চমকই ভিন্ন—মানুষ, প্রকৃতি, ভৌত কাঠামো এবং রাস্তাঘাটের শত রকম যানবাহন মিলে একটি শহরের চরিত্র তৈরি করে। লন্ডন ওর বেশ ভালো লাগার শহর হয়ে উঠেছে। শীতে কাবু হয়ে গেছে শহর। বাসস্ট্যান্ডে বাসগুলো বেশ দেরিতে আসে। মাঝে মাঝে শীতে জমে যাওয়ার জোগাড় হয়, এ এক ভারি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা–দেশে এই অভিজ্ঞতা হতো না। বরফের ছবি তুলে মাকে পাঠিয়েছে। সাবিহা বানু প্রায়ই ওকে ফোন করে। নিজের কথা বলে, ওর কথা জানতে চায় বাতি বন্ধ করে লেপের নিচে শুতে শুতে ওর মনে হয় শহরটাকে ও বেশ চিনেছে–কোথায় সেলুন, কোথায় বইয়ের দোকান, অ্যান্টিক্স কোথায় পাওয়া যায়, কোথায় রানির বাড়ির লোকেরা শপিং করে কোথায় নেপালি রেস্তোরাঁয় ছেলেরা কপালে সিঁদুর লাগিয়ে খাবার সার্ভ করে, কোথায় নাইট ক্লাবের আলো সারাক্ষণ জ্বলে অথবা পুরনো রেকর্ড আর ক্যাসেটের দোকানের

গান ভেসে আসে, সিনেমা, থিয়েটার দেখা, বড় শপিং সেন্টারে ঢুকে অকারণে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে সময় কাটানো–এসব এখন নখদর্পণে। হাইড পার্ক, মাদাম তুসো, সোয়াস, টেট গ্যালারি, কিউই গার্ডেন, টেমস নদী, আর্ট গ্যালারি–নইলে দূরে কোথাও, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, লিডস, বার্মিংহাম, ব্রাইটন, ডোভার–নাহ, অনেক কিছুর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। যদিও সাবিহা বানু ফোনে সব সময় বলে, শেখার জন্য যা লাগে খরচ করবি, আমার মেধাবী ছেলেটি কোথাও আটকে যাবে এটা আমি ভাবতেই পারি না। সোনা আমার, অনেক বড় হবি। অনেক কিছু শিখতে হবে তোকে। হায়, মায়ের কত স্বপ্ন ছেলেকে নিয়ে! মানুষ' হওয়ার শিক্ষাটাও তো এর মধ্যেই পড়ে। মা তো আলাদাভাবে মানুষ হওয়ার কথা বলে না। মা তো জানে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া কি। কিন্তু খটকা লাগে তন্ময়ের, ও ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে কি মা এভাবেই লালন-পালন করত, এভাবে স্বাধীনতা দিয়ে নিজের মতো করে বড় হওয়ার স্বাধীনতা? তন্ময় দুচোখ এক করার আগে ভাবে, বোধহয় না। এজন্যই তো নীলিমাদের চোখে এত জল।

চব্বিশ নম্বর বাসটা ধরার জন্য ওকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হয়, অন্তত দশ মিনিট তো বটেই। এরপরই ক্যামডেন টাউনের কাছাকাছি এসে স্টপেজ। ওখান থেকে বাস মর্নিংটন ক্রিসেন্ট টিউব স্টেশনের কাছে এসে ডানে মোড় নেয়, সেখান থেকে সোজা ওয়ারেন স্টেশন ছুঁয়ে ম্যালেট স্ট্রিটে তন্ময়ের স্কুল। সব মিলিয়ে এক ঘন্টার পথ, বাসে বসার জায়গা পাওয়া যায় না এমনটা হয় না, দেশের মতো বাসে ঠেলাঠেলি নেই। কত নিঃশব্দ, কত সৌজন্য, সব মিলিয়ে এক মিগ্ধ পরিবেশ–শুধু শীতে কষ্ট হচ্ছে, অপেক্ষা একদিন সামার আসবে, ফুরফুরে হয়ে যাবে শহরের জীবনযাপন। বড় বড় গাছগুলো নানা রঙের ফুলে ভরে উঠবে, তখন আর এক ধরনের ছবি ওঠাবে ও। এমন বৈপরীত্য দেশের আবহাওয়ায় নেই, ঋতু বদল আছে, সেটা আমূল বদলে দেয় না প্রকৃতির চেহারা। স্কুলে দেখা হয় মাধবী কুট্টির সঙ্গে, ও ভারতের কেরালার মেয়ে, নরমসরম, গোবেচারা ধরনের মেয়ে, নিজের মতো একা একা থাকতে ভালোবাসে। তন্ময়ের জানতে ইচ্ছে করে ওরও কি নীলিমার মতো সমস্যা আছে, নাকি ও ভীষণ সুখী মেয়ে, মাথার ওপর পুরুষের প্রভুত্বের কোনো চাপ নেই। কিন্তু ভিন্ন দেশের মেয়ে বলে ওর সঙ্গে ক্লাসের বন্ধুত্ব ছাড়া আলাপ বেশি দূর গড়ায়নি। আজো ওকে দেখে বলে, হাই!

ব্যস এটুকুই। তন্ময়ও মাথা নাড়িয়ে জবাব দেয়। জিজ্ঞেস করে, আমি তো দেরি করে ফেলেছি, তুমি ক্লাসে যাওনি।

ক্লাস হবে না। প্রফেসর শরীর খারাপ বলে বোর্ডে নোটিশ দিয়েছেন।

তন্ময় হাত উল্টিয়ে এমন ভঙ্গি করে যে, সে ভঙ্গি দেখে মাধবী হেসে বলে, হতাশ হলে?

একটুও হতাশ হবো না, আমরা দুজনে ক্যান্টিনে বসে চায়ের কাপে ঝড় তুলব।

আমি রাজি।

চলো সোয়াসের ক্যান্টিনে যাই।

দুজনে রাস্তা পার হয়ে সোয়াসে আসে। তন্ময় এখান থেকে মায়ের সঙ্গে কথা বলে।

তুমি কেমন আছ সোনা মা আমার?

অপর প্রান্ত থেকে সাবিহা বানুর হাসির শব্দ শোনা যায়। তন্ময় জিজ্ঞেস করে, আমি তোমার ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে কি তুমি আমাকে এমন স্বাধীনতা দিতে?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

বলো না মা।

সাবিহা বানু ধীর কণ্ঠে বলে, আমাদের সমাজ মেয়েদের একা বড় হওয়ার সুযোগ দেয় না। আমিও তো এই সমাজের বাইরের কেউ না, তুই মেয়ে হলে আমাকেও রশি টানতে হতো, পুরো স্বাধীনতা দিতে পারতাম না।

সত্যি বলার জন্য থ্যাঙ্কস মা। তোমার কাছে ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। রাখি এখন, একটি ইন্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে চা খেতে যাব।

ও ফোন রেখে দিলে মাধবী কুট্টি বলে, তুমি মাকে খুব ভালোবাসো তন্ময়?

হ্যাঁ, ভীষণ ভালোবাসি। তাছাড়া মাকে তো সব ছেলেমেয়েই ভালোবাসে। তুমি বাসো না?

বাসি, কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমার বিরোধ আছে। চলো চা খেতে খেতে তোমাকে আমার গল্প বলব।

তন্ময় মনে মনে বলে, হায় ঈশ্বর, আবার গল্প!

দুজনেই যার যার পছন্দের চসিআর স্ন্যাক্স নিয়ে টেবিলে বসে। আশপাশে আর কেউ বাংলাদেশি বা ভারতীয় নেই, সবাই ইউরোপ বা আফ্রিকার, আমেরিকারও হতে পারে, বোঝা যাচ্ছে না। তন্ময় স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে বলে, আমার মা চমৎকার স্যান্ডউইচ বানায়। ছোটবেলায় আমি খুব স্যান্ডউইচ খেতাম।

মাকে নিয়ে তোমার অনেক স্মৃতি তন্ময়?

হ্যাঁ, অনেক, অনেক। মা আমার জীবনে ভীষণ আনন্দ।

ওর উচ্ছ্বাসে তেমন সাড়া দেয় না মাধবী কুট্টি। ধীরেসুস্থে স্যান্ডউইচ শেষ করে। দৃষ্টি প্লেটের ওপর, ভ্রু কুঁচকে আছে, ওর ঘন কালো লম্বা চুলের মোটা বেণিটা বুকের ওপর দিয়ে অনেকখানি নেমে এসেছে, বেণির মাথায় একটি সবুজ রঙের ফিতা জড়ানো। গায়ে হালকা নীল রঙের টি-শার্ট, ওকে সব সময় জিনস পরতেই দেখেছে তন্ময়। স্যান্ডউইচ খেয়ে ও চায়ের কাপে চুমুক দেয়। বলে, মায়ের কথা ভাবতে আমার বেশি ভালো লাগে না।

তন্ময় চুপ করেই থাকে, নিজের কথা নিজেই বলুক মাধবী, তন্ময় খুঁচিয়ে শুনতে চাইবে না, খোঁচাতে গেলে স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ও গভীর মনোযোগ দিয়ে মাধবীকে লক্ষ্য কর বেশ কালো গায়ের রঙ, আবার ব্ল্যাকদের মতো কালো নয়– নারকেল গাছের সারিতে সুশোভিত সাগর-কন্যা কেরালার সবটুকু বৈশিষ্ট্য বুঝি ওর মাঝে আছে একদিন ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ এসে ভিড়েছিল এ রাজ্যের সমুদ্র উপকূলে। হঠাৎ খেয়াল করে মাধবীর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ল টেবিলের ওপর। ও মৃদু স্বরে ডাকে, মাধবী!

ও দু-হাতে চোখ মুছে বলে, সরি। তারপর হেসে বলে, কী ছেলেমানুষি করছি, আমরা তো চায়ের কাপে ঝড় তুলতে এসেছিলাম।

তার জন্য সময় শেষ হয়ে যায়নি।

পরিস্থিতিটা আমিই একটু অন্যরকম করে ফেললাম।

আমার ভালোই লাগছে।

চোখের জলও।

আনন্দেও মানুষের চোখে জল আসে। তোমার হয়তো কোনো আনন্দের স্মৃতি মনে পড়েছে।

না তন্ময়, আনন্দ নয়, কষ্টের। তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বললে, আমি এখানে এসে একদিনও মাকে ফোন করিনি। আমার ভালো লাগে না তন্ময়। আমার ঘর ভাঙা মা মেনে নেয়নি। মা চেয়েছিল আমি স্বামীর সংসার মুখ বুজে করব। আমি তা মানতে পারিনি, সেজন্য ...

থাক এসব কথা। মেয়েদের যে কবে এসব থেকে মুক্তি ঘটবে জানি না। যেতে হবে অনেক দূর।

চলো টেট গ্যালারি ঘুরে আসি।

হ্যাঁ, চলো টেমস নদীর পাড়েও কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারব। নদী দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

আমারও। তুমি কি জানো আমাদের দেশটায় নদী ভরপুর। অসংখ্য নদী, নামগুলোও খুব সুন্দর।

তাহলে আমি একদিন বাংলাদেশে বেড়াতে যাব।

আমাকে যোগাযোগ করবে। আমি তো তোমাকে ঠিকানা দিয়েছি।

তোমার মাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে। আর দেশে ফিরলে তো তুমি বিয়ে করবে। অনিমার সঙ্গেও আলাপ হবে।

তন্ময় মাধবী কুটির সারল্য উপভোগ করে। তারপর নদী দেখতে দেখতে মাধবী ওর কথা বলে, নীলিমার মতোই কথা, তফাত একটুখানি মাধবীর গল্পে মায়ের নেতিবাচক ভূমিকা আছে।

অনেক রাতে অনিমাকে মাধবী কুটির কথা জানাতে চিঠি লিখতে বসে তনয়। টেরই পায় না যে বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। জানালায় মোটা পর্দা, ঘরে হিটারের ছড়িয়ে দেয়া উষ্ণতা। টেবিলে সাজানো অনিমার ছবিটা হাতে নিয়ে বলে, আমার চিঠিগুলো তুমি পাচ্ছ কি-না বুঝতে পারছি না। কত দূর ফুলমসি স্টেশন, ঢাকার চিঠি যেতে অনেক সময় লাগে, আর আমি তো সাত-সমুদ্র তেরো নদী পার থেকে লিখছি। ও টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়ে ঘরের অন্য বাতি বন্ধ করে দেয়। অনিমাকে লেখার জন্য চমৎকার একটি প্যাড কিনেছে, আজই এই রাইটিং প্যাডের প্রথম পৃষ্ঠার ব্যবহার–প্রিয় অনিমা, আমার ভালোবাসার প্রথম নারী, কেমন আছ তুমি, জানি সারাক্ষণ মনে করো আমার ফেলে আসা দিনগুলো। অপেক্ষা করে আছ আমার ফেরার। ফেরার আর বেশি দিন নেই। কোর্স শেস হলে একদিনও এ দেশে থাকব না।

আজ তোমাকে মাধবীর কথা শোনাব। ওর মুখেই শোনো : মা চেয়েছিল আমার বিয়েটি যেন ভেঙে না যায়। আর আমার মনে হয়েছিল, আমি আমার সন্তানকে ভাঙা পরিবারের সন্তান করব না। এই বাজে লোকটির কাছ থেকে আমার দ্রুত চলে যাওয়াই মঙ্গল। বাসররাতে লোকটি মাতাল হয়ে এসেছিল। পরে জেনেছিলাম বেশ কয়েকজন নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কও ছিল। আমার কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম ছিল না ওর কাছে। আমি ছিলাম ব্যবহার্য কাপড়ের মতো। মাকে এসব বলাতে মা বলে, মুখ বুজে ঘর করো। বেশি বাড়াবাড়ি করবে না। ও তো তোমাকে রানির হালে রেখেছে। আসলে লোকটার টাকা দেখে আমার মা আমাকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের মর্যাদার কাছে আমি তো অর্থকে তুচ্ছ মনে করতাম। মাকে তা বোঝাতে পারিনি। তাই একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে বান্ধবীর কাছে আশ্রয় নেই। নানা জায়গায় কাজ করি, তাতে নিজের চলবে তো, লোকটি আমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগল। নানাভাবে হ্যারাস করা শুরু করল। শেষে একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে এখানে চলে আসি। দেশে আর ফিরব না ঠিক করেছি। বলছিলাম মায়ের কথা, আমি একা বিদেশে আসব শুনে মায়ের তো ভিরমি খাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। তারপরও কালিকট বিমানবন্দরে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিল মা। অন্য সময় আমি ভারতের অন্য কোনো জায়গায় গেলে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত মা, এবার রাগী চেহারায় দাঁড়িয়ে রইল–বুঝলাম চাপা রাগ আর কান্নায় থমথম করছে মা। আমি তো বাইরের পৃথিবীতে পা দিয়েছি, ফেরার পথ একবারও ভাবছি না। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ, এবার আমাকে বিদায় নিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে আমি নিজে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলে মা আমাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল ধাক্কাটা আমার গায়ে লাগেনি, লেগেছিল বুকে। মনে হয়েছিল মা-মেয়ের বন্ধনের যে সুতোর ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম সেটাও ছিঁড়ল। ছিঁড়ুক, বুক ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু চোখ থেকে জল ঝরতে দেইনি। গটগট করে ইমিগ্রেশন পেরিয়ে যেখানে যাত্রীরা অপেক্ষা করে সেখানে পৌঁছে যাই, একবারও পেছন ফিরে তাকাইনি। প্লেনে ওঠার পরে, প্লেনের সাথে সাথে আমিও অন্ধকারে ডুবে যাই, তখন আমার সামনে অসীম শূন্যতা ছাড়া আর কোনো গন্তব্যস্থল ছিল না। একজন আমার প্রিয় মানুষ ছিল, তার কাছ থেকে এত বড় আঘাতটা আসবে আমি ভাবিনি, আমি মেয়ে, বারবার তিনি আমাকে এটা বুঝিয়েছিলেন। তার দোষ নেই, তিনিও নারী হিসেবে এই রকম আচরণই পেয়েছিলেন। এবং সেই রকম পথেই আমাকে হাঁটতে হবে তা ধরে নিয়েছিলেন। তারপরও ভীষণ কষ্ট পেয়েছি যখন দেখেছি আমাকে সমর্থন না করে, তিনি ওই বাজে

লোকটিকে ক্রমাগত সমর্থন করছিলেন। কারণ আমাদের সমাজে তো কখনো একা বড় হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না, একা থাকতে চাইলেও ক্রু কুঁচকায়। কিন্তু লন্ডনে এসে আমি নিজের মতো করে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছি। একদিন খুব মন খারাপ লাগছিল। দেশে থাকতে সুখ-দুঃখ সামাজিকভাবে অনুভব করতে শেখানো হয়েছিল, এখানে এসে পেলাম ব্যক্তির মর্যাদা। বলছিলাম মন খারাপের কথা। প্রবল মন খারাপ নিয়ে ফুটপাথে বসে জোরে জোরে কাঁদছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি এক বুড়ো দম্পতি আমার ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা পার হয়ে অপর পাশে চলে গেল। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওদের সম্মান দেখানো আমাকে খুব স্বস্তি দিয়েছিল। মানুষ হওয়ার যে যাত্রায় পা বাড়িয়েছি সেই লক্ষ্যে যেন পৌঁছাতে পারি সেই সাধনা করছি। প্রতিনিয়ত ভাবি আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার এই জীবন আমি চেয়েছিলাম। লন্ডন আমাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছে।

একদিন তুমি এভাবে নিজেকে আবিষ্কার করতে চাইবে কি না আমি জানি না অনিমা। নীলিমা কিংবা মাধবী শুধু মেয়ে হিসেবে আমার বন্ধু নয় এখন, ওরা আমার সামনে এক একটি দরজা খুলে দিচ্ছে, সেই দরজা দিয়ে হুহু করে বাতাস এসে আমার ভাবনা এলোমেলো করে দিচ্ছে। আমি আমার মাকে দেখেছি একভাবে, তোমার সঙ্গে গড়ে উঠবে ভিন্ন সম্পর্কের সেতু, সেটা অনেক ভাবনার, অনেক চিন্তার সেতু। ভুল হলে সেই সেতু হুড়মুড়িয়ে ভাঙবে। তাই নিজেকে বুঝে ওঠার সুযোগটা আমি ছাড়তে চাই না। তোমার কাছে যখন ফিরে যাব, দেখবে ভিন্ন তন্ময়কে, যে তোমাকে বোঝার জন্য নিজের অনুভবের দরজা খুলে রাখবে। আজ এ পর্যন্ত–তোমার তন্ময়।

খামে গাম লাগিয়ে চিঠিটা স্কুলের ব্যাগে ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ে তন্ময়। বাইরের তুষারপাত ওর দেখা হয় না। যে প্রবল তুষারপাত দেখার জন্য ও উদগ্রীব হয়েছিল। পরদিন শনিবার, স্কুল বন্ধ। বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল–সকালের আনন্দ উপভোগ করার জন্য গড়াগড়ি করল অনেকক্ষণ, যেন লেপের সঙ্গে হুটোপুটি খেলা এবং শৈশবে ফিরে যাওয়া–এক অদ্ভুত শৈশব, আনন্দ এবং বেদনার ঘুণপোকা সেই শৈশব অনবরত কেটেছিল। তারপরও ভালো আছে ও। অনেকক্ষণ গড়াগড়ির পর টের পেল যে ক্ষিদে পেয়েছে। খাট থেকে নেমে জানালার পর্দা সরাতেই চোখ স্থির হয়ে যায়, বিস্ময়ে চোখের পাতা পড়ে না। জানালার কাছে গিয়ে কাচের ওপর নাক লাগিয়ে রাখে, বিস্ময়ে চোখ

সরে না একদম পাল্টে গেছে, বাড়িঘর, গাছপালাগুলো। রূপকথার সেই অচিনপুরী, যা দেখা যায় কল্পনায়, বাস্তবের হিসাব সেখানে মেলে না। আকাশ থেকে অবিরাম নামছে সাদা তুলোর মতো হালকা বরফ, এ দৃশ্যের বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, তন্ময় ক্ষিদের কথা ভুলে যায়। চারদিক ধোয়াশা করে দিয়ে বরফের কুচি ম্যাধুর হাতে তৈরি হওয়া পরীর মতো নাচছে। তন্ময়ের একবার ইচ্ছে হয় বাইরে গিয়ে সেই বরফের কুচির নিচে দাঁড়িয়ে থাকে, পরক্ষণে ভয় পায়, অসুস্থ হয়ে যাওয়ার একশ ভাগ, আশঙ্কা আছে। নিউমোনিয়া হলে তো রক্ষাই নেই। ও এক ছুটে গিয়ে কফি বানিয়ে সঙ্গে স্কটিশ কুকি নিয়ে জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসে। বাংলাদেশের আষাঢ় মাসের আকাশ কালো করে নেমে আসা তুমুল বৃষ্টি ওর প্রিয় দৃশ্য–দোতলার বারান্দায় বসে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে গিয়েও ও সেই বৃষ্টি দেখত, মায়ের বকুনি কোনো কাজে আসত না। তারপর ঠান্ডা লেগে গেলে সরষের তেলে রসুন দিয়ে গরম করে বুকে-পিঠে মালিশ করে দিত মা। এখানে তো কেউ নেই। বরফ পড়া বন্ধ হলে প্রথমেই মাকে ফোন করে খবরটা দিতে হবে। মা খুশি হয়ে বলবে, আমার সোনালি ঈগল, আজ তুমি আকাশে উড়তে যেও না। কে তোমার ঠান্ডা নামাবে, নিজের শরীরটাকে নিজেই দেখাশোনা করো। তন্ময় নিজের ভাবনায় মশগুল হয়ে বলে, তোমার কথা ভেবেই আমি পাগলামি থেকে পিছিয়ে আছি মা। আমি তোমার লক্ষ্মী ছেলে। জীবনের প্রথম বরফ দেখা উপভোগ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে যায় তন্ময়ের। এখন কী করবে? রাস্তাটা কাদা-কাদা হয়েছে, হালকা পানির চিহ্ন দেখা যায় চারদিকে। ও আবার লেপের ভেতর ঢোকে।

সেদিন বিকেলেই নীলিমা কথাটা বলে।

ম্যাথুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে তন্ময়। ও দারুণ লোক।

কগ্রাচুলেশন্স নীলিমা।

উদারভাবে বলছ নাকি জেলাসি থেকে?

জেলাসি? তন্ময় অবাক হয়। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার আবার জেলাসি কি? তুমি আমার বন্ধু মাত্র। তোমাকে আমি ভালোবাসি

নীলিমা, যে জেলাস হবো।

বাব্বা, সামান্য একটি কথায় এত জবাব দিলে! যাকগে, শোনো, আমি ম্যাথুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে এক রাত ছিলাম। ওর বাড়িকে পাথরের মিউজিয়াম বলা যেতে পারে। কত যে প্রকার, কত যে রঙ সেসব পাথরের দেখলে তুমি অবাক হবে। যাবে একদিন?

নিশ্চয়ই যাব। ম্যাথুকে তো আমিও খুব পছন্দ করি। তোমাকে বলেছি না?

তুমি না হলে তো ওর সঙ্গে আমার দেখা হতো না। তুমি আমাকে এই যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছ তন্ময়। আমি ঠিক করেছি কোর্সটা শেষ হয়ে গেলে আমি আর ম্যাথু একসঙ্গে থাকব। আমিও ওর কাছ থেকে লকেট বানানোর কাজ শিখব।

তোমার ফটোগ্রাফি?

ওটাও থাকবে, দুটোই কাজ কিন্তু একটা আর একটার পরিপূরক। তোমার কী মনে হয়?

আমার আর একটু ভেবে দেখতে হবে।

আচ্ছা ভাব। তবে ভেবে কিন্তু রাতের ঘুম হারাম করো না।

বয়েই গেছে আমার। তোমার জন্য ভেবে রাতের ঘুম নষ্ট করব কেন? যাকগে, এখন কোথায় যাচ্ছ?

আজ তো ম্যাথুর দোকান বসবে। ওখানে যাব। তুমি যাবে?

হ্যাঁ, যেতে পারি।

দাঁড়াও আসছি, বলে নীলিমা একছুটে নিজের ঘরে যায়। তন্ময় বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবে, অনিমাকে আর একটি চিঠি লেখার গল্প পাওয়া গেল। বড় দ্রুত নীলিমা সিদ্ধান্ত

নিয়েছে। ও তো জানে, বছর দুই আগে ম্যাথুর বউ ওকে ছেড়ে যায়। ওদের কোনো বাচ্চা নেই। এর বেশি কিছু ম্যাথু ওকে বলেনি। তবে ম্যাথুর বাড়িতে ওর যাওয়া হয়নি, সে সুযোগও হয়নি–তেমন জোরালো বন্ধুত্বও তৈরি হয়নি যে ম্যাথু ওকে ডিনার খাওয়ার কথা বলবে। ও নিজেও ম্যাথুকে কোনো ক্যাফেতে নিমন্ত্রণ করেনি। কিন্তু নীলিমার সঙ্গে কত অল্পে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল—এটা নারী-পুরুষের সম্পর্ক, শেষ লক্ষ্য শরীর। আবার এই সম্পর্কের নানা জটিলতা নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে, তারপরও সম্পর্কের গিট্টু গাঁথা হয়। জীবনের কত যে মাত্রা। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ওকে স্পর্শ দিয়ে যায়, হিমশীতল স্পর্শ। তন্ময়ের শীতল স্পর্শ ভালোই লাগে, ও উপভোগ করে, সবসময় উষ্ণতা পেতে হবে এর কোনো যুক্তি নেই। তাছাড়া প্রকৃতির স্পর্শের মাত্রা ভিন্ন, এ স্পর্শ নারী বা পুরুষের নয়–এ স্পর্শ নির্লোভ-নিঃস্বার্থ, বিনিময় চায় না।

এসব ভাবনার মাঝে নীলিমা এসে দাঁড়ায়।

দূর থেকে মনে হচ্ছিল তুমি যেন কিছু ভাবছ?

স্পর্শের অনুভূতির কথা ভাবছিলাম। মানে?

এই যেমন প্রকৃতির স্পর্শে বিড়ম্বনা নেই, কিন্তু মানুষের স্পর্শে হাজার রকম বিড়ম্বনা তৈরি হয়।

ঠিক বলেছ। খুবই মৌলিক কথা।

স্পর্শের কারণে সম্পর্কও তৈরি হয় অল্প সময়ে।

ঠিক বলেছ, নীলিমা সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় এবং এও বলে যে, আমি জানি ম্যাথুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়েই তোমার এত কথা।

হো হো করে হাসে তন্ময়। বুঝে যায় এলাকাটা নীলিমার খুবই চেনা হয়ে গেছে। নীলিমা আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে, পেছন থেকে তন্ময় অন্য দিকে চলে যায়। দেখতে পায় যে যার

কাজে ব্যস্ত, তা আয়না মোছাই হোক বা বন্ধুর সাথে আড্ডাই হোক। তন্ময় অকারণে ঘুরে বেড়ায়–গন্ধ নেয়, ছুঁয়ে দেখে, দাঁড়িয়ে থাকে, কারো গায়ে ধাক্কা লাগলে সরি। বলে। সারিবদ্ধভাবে চামড়ার বিভিন্ন ধরনের জিনসের দোকান সাজানো–এদের মধ্যে বেশি আছে জ্যাকেট, বুটজুতো, ব্যাগ। তন্ময় একটি কালো রঙের জ্যাকেট কেনে। ঘড়ির দোকান আছে কয়েকটা মায়ের জন্য একটি ঘড়ি কিনবে বলে ভাবে, কিন্তু সাবিহা বানুর কড়া নিষেধ আছে কিছু কেনার ব্যাপারে, বলেছেন, শুধু সখিনার জন্য একটা কিছু কিনতে। ও নেড়েচেড়ে রেখে দেয়। হিপ্পিদের পোশাকের দোকানগুলো বেশ দেখার মতো। মেয়েদের কিছু কিছু পোশাক দেখে ওর হাসি পায়। এসব পোশাক পরে কোনো মেয়ে ঢাকা শহরে হাঁটতে পারবে না, এমনকি বিদেশি মেয়েরাও নয়। ঘুরেফিরে ম্যাথুর দোকানে আসে। ম্যাথু ওকে দেখে উজ্জ্বল চোখে তাকায়, আগের মতো বিবর্ণ ভাব নেই ওর চেহারায়। হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যান্ডশেক করে বলে, তুমি অনেক দিন আসোনি।

নীলিমা হাসতে হাসতে বলে, ও খুব ব্যস্ত। ও ফটোগ্রাফি কোর্সের সিরিয়াস ছাত্র। আমার মতো ফাঁকিবাজ নয়।

ম্যাথু হা হা করে হাসে। তন্ময় ওর আনন্দে সাড়া দিতে পারে না। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, আজ কোন লকেটটা বেশি বিক্রি হলো।

নীলিমা আগ বাড়িয়ে বলে, পরীর। ওই লকেটটা সবার পছন্দ।

হা হা করে হাসে ম্যাথু। তন্ময় আকস্মিকভাবে উপলব্ধি করে যে ম্যাথু আজকে অনেক বেশি উচ্ছল–কারণে-অকারণে হেসে আনন্দ প্রকাশ করে মাথায় তুলছে ওর চারপাশ, নীলিমার স্পর্শ কি বদলে দিল ম্যাথুর সবটুকু প্রকৃতি? কোথাও একটুও ফাঁক নেই, এটাই সত্যি–এরই নাম জীবন। তন্ময়কে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ম্যাথু হেসে বলে, নীলিমা চমৎকার মেয়ে, ঠিক পরীর মতো ওর মধ্যে স্বপ্ন এবং বাস্তব মিশে আছে।

সত্যি? তন্ময় চোখ বড় করে নীলিমার দিকে তাকায়। নীলিমা মৃদু হেসে আস্তে করে বলে, তোমাকে বলেছি তো সব। লুকাইনি কিছুই।

একটি বিষয় লুকিয়েছ।

কী?

আমাকে বাদ দিয়ে ম্যাথুর কাছে এসেছ। কবে এত কিছু হয়ে গেল জানতেও পারলাম না।

আগেভাগে সব কিছু জেনে গেলে চমক পাবে কী করে? চলো যাই। নান্দোসের চিকেন খেয়ে আসি।

আজ না। আর একদিন।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তন্ময় আবার একলা হয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, ওর আসল নাম আশরাফুল হক। আসল মাকে ও কোনো দিন দেখেনি। পালক মায়ের যে ভালোবাসা পেয়েছে সেটা মাধবী কুটির অভিজ্ঞতার বিপরীত, গভীরভাবে উল্টো, তাহলে ভালোবাসার সত্যিকার কোনো ঠিকানা নেই–জন্মের পরে অসংখ্য আসল মা তো শিশুদের ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। উপায়হীন সেসব মায়েদের নিজেদের ভাবনার জায়গা যেমন নেই, তেমনি নিজের সন্তানদের জন্যও ভাবনার জায়গা নেই। উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের এটাই নিয়তি। লে বাব্বা, আমি আবার তাত্ত্বিক ভাবনা ভাবতে বসলাম, হয়েছে কি আমার। ও নান্দোস রেস্তোরাঁয় ঢোকে ঝাল চিকেন আর হলুদ ভাত খাওয়ার জন্য। এটা পর্তুগিজদের দোকান। ওকে দেখে পর্তুগিজ ছেলেটি ছুটে আসে। মেনুটা এগিয়ে দিয়ে বলে, হাই।

তন্ময় মাথা নাড়ালে বলে, তোমার গার্ল ফ্রেন্ড আসেনি?

তন্ময় মুচকি হেসে বলে, আমার ফ্রেন্ড অন্য কাজে ব্যস্ত। তুমি আমাকে সেদিনের মেনুটাই সার্ভ করো।

ছেলেটি চলে যায়। একটু পরে খাবার আনে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, ওর চোখ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করলে ও একটুখানি মিষ্টি জাতীয় কিছু নিয়ে ছুটে আসে না। তন্ময় কোক খেয়ে নিজেকে সামলায়। বুঝতে পারে, নীলিমা ওর ভালোবাসা পেয়েছে, নারী বলে কি? কে জানে, ওর হয়তো কোনো স্মৃতি আছে নীলিমাকে নিয়ে কিংবা নীলিমার মতো কাউকে ও পর্তুগালে রেখে এসেছে। কে জানে, ও হাত ওলটায়, ঝাল খেতে খেতে অনিমাকে চিঠি লিখবে বলে মনে করে, এখন পর্যন্ত অনিমার কাছ থেকে কোনো চিঠি পায়নি। তাতে কি, ফুলমসির মতো অখ্যাত স্টেশনে এত দূর থেকে কোনো চিঠি হয়তো পৌঁছায়নি।

ঘরে ফিরে ওর মন খারাপ লাগে। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে ও অনিমার জন্য কেনা লকেটটা ঘরের বিভিন্ন জায়গায় রেখে অনেকগুলো ছবি তোলে। ছবিগুলো অনিমাকে পাঠাতে হবে। বাসার কাছেই একটি পোস্ট অফিস আছে, এটা ও আগে খেয়াল করেনি। একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ভেতর ছোট্ট এক কোনায় দুটো লোক এই পোস্ট অফিস চালায়। পরে জেনেছে এখানে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে পোস্ট অফিস চালাতে পারে সরকারের অনুমতি নিয়ে। ধারণাটা মন্দ নয়, তাহলে বাংলাদেশের অনেকে কাজের জায়গী খুঁজে পাবে, মানুষের হাতের নাগালে থাকবে ডাক ব্যবস্থা। এক কাপ কফি খেয়ে তন্ময় অনিমাকে চিঠি লিখতে বসে। হঠাৎ করে উপলব্ধি করে মন খারাপের বোধ ও ছাড়াতে পারেনি। আসলে সেই পর্তুগিজ ছেলেটি কেন ওর জন্য খানিকটুকু মিষ্টি জাতীয় কিছু নিয়ে ছুটে আসেনি, তা ওর বুকে বেজেছে। নীলিমা থাকলে হয়তো ঠিকই আসত। পরমুহূর্তে নিজেকে শাসন করে ও, কেন এভাবে ভাবছে, নীলিমার সঙ্গে ওই ছেলেটির বন্ধুত্ব বেশি দিনের, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে মাত্র একবার। ছেলেটির কাছে নীলিমার মতো প্রত্যাশা কেন ওর থাকবে? পরিচয় বেশি দিনের হলে ঠিকই ওর কাছে আসত। এর পরে যখন যাবে তখন ও ঠিকই আসবে, এমন ভাবনার সাথে সাথে ওর ভেতরের বরফ গলতে শুরু করে। যে কলমটা দাঁতে কামড়ে রেখেছিল সেটা নেমে আসে লেখার কাগজের ওপর। প্রিয় অনিমা, প্রিয়তম... কেমন আছ তুমি? অনেক কিছু তোমাকে লেখার আছে, কিন্তু লিখতে পারছি না। শরীরের এমন মারমুখী আচরণ, যখন তখন বেঁকে বসে, গাল ফোলায়, রাগ করে–ভারি বিপদ এই দুষ্ট ছেলেটিকে সামলাতে...। আর লেখা হয় না তন্ময়ের। লাইট বন্ধ করে লেপের নিচে ঢুকে পড়ে।

দুদিন পরে ডাকে একটি চিঠি আসে ওর নামে। মাধবী কুট্টি লিখেছে। এত দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তারপরও চিঠি লেখা কেন মাধবীর? ও। চিঠিটা খোলে না, টেবিলে রেখে ক্লাসে যায়, ফেরার পথে সেফওয়েতে ঢুকে কিছু খাবার কেনে। রাতে ঘুমুবার আগে লেপের ভেতরে শুয়ে মাধবী কুট্টির চিঠি খোলে। নিজেকেই বলে, কেন এতটা সময় নিলাম চিঠিটা খুলতে? আমি কি ভেবেছি মাধবী আমাকে প্রেমের চিঠি লিখেছে? না, যে চিঠিই লিখুক না কেন চিঠিটা পেতে ওর খুব ভালো লেগেছে, সেজন্য এক ধরনের উত্তেজনা ছিল নিজের ভেতরে সুখ অনুভবের রেশ ছিল। মাথার কাছে রাখা টেবিল ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় গুটি গুটি অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা চিঠিটায় ও মগ্ন হয়ে যায়।

ডিয়ার তন্ময়, তোমাকে আমার ফেলে আসা দিনের অনেক কথা বলেছি। তোমাকে আমার খুব আপন মনে হয়েছে। তুমি অকারণে পুরুষের দৃষ্টি নিয়ে তাকাও না কোনো নারীর দিকে, আগ বাড়িয়ে, ঝুঁকে পড়ার কোনো ন্যাকামি নেই তোমার, নারীর কোনো অঙ্গ ছুঁয়ে ফেলার হ্যাংলামি নেই তোমার। অথচ তোমার পুরুষের দীপ্ত ভঙ্গি আছে, জীবনকে বড় করে দেখার উদারতা আছে, তোমাকে একজন দীপ্ত মানুষ মনে হয়েছে আমার। প্রিয় তন্ময়, এই শহরে তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু, যাকে আমি সব স্বার্থের ঊর্ধ্বে নির্ভর করতে পারি। সেজন্যই এই চিঠি লেখা। কথাগুলো আমি সামনাসামনি বসে তোমাকে বলতে পারতাম না। তোমার সঙ্গেই আমার নিজের কথা শেয়ার করতে ভালো লাগে, নইলে গুমোট দম বন্ধ করা অবস্থা আমাকে কুরে খায়। যত দিন যাচ্ছে ততই উপলব্ধি করছি কত ভাবে আমাকে মানসিক পীড়ন করা হয়েছিল। অবজ্ঞা, অবহেলা, কটুক্তি, অবিশ্বাস, অপমান কিছুই বাদ ছিল না। তুমি তো বোঝ যে দেশে মারধর করা স্বামীর অধিকারের মধ্যে পড়ে সে দেশে কথার পীড়ন তো কোনো আলোচনার বিষয়ের মধ্যেই পড়ে না। আমাকে আমার নিজস্ব যা কিছু বোধ তা শক্ত বাঁধনে আটকে রেখে বলা হবে স্বামী তার ভালোবাসার দায় পালন করছে। স্ত্রীকে মর্যাদা দিয়ে প্রতিপালন করা হচ্ছে। বলো তন্ময়, আমি কি শিশু! শিশুকেও খেলতে দেয়া হয়, শিশুর এক ধরনের স্বাধীনতা থাকে, বাবা-মায়ের বকুনি খেয়েও শিশু কিন্তু নিজের মতো আচরণই করে। কিন্তু আমি দেখেছিলাম আমার চারপাশে টানা ছিল লক্ষণরেখা, আমার সামনে ছিল সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্মনিয়মকানুনের দেয়াল, আর ছিল সংসারের ভালোবাসার নামে শিকল। আমি আমার মতো করে ভাবতে পারতাম না, যা ভালো লাগে তা বলতে পারতাম না, যা চাই তা জানাতে পারতাম না।

তুমি তো জানো তন্ময়, সবাই মিলে আমরা অধিকারের কথা বলি, আমার জিজ্ঞাসা, এসব কি তার বাইরে? আমি কি শুধুই ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তাটকর জন্য এই সংসারটা ধরে রাখব? সে তো নিজেই জোগাড় করতে পারি। তন্ময় বিশ্বাস করো, আমি একজন মানুষকে চেয়েছি। জীবনযাপনের সঙ্গী হিসেবে। পুরুষ কিংবা স্বামী (প্রভু) নয়। একবার মনে হয়েছিল একটা বাচ্চা থাকলে মন্দ হতো না, নিজেকে স্বস্তিতে রাখার একটি অবলম্বন পেতাম কিন্তু পরে নিজের স্বার্থপরতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি একটি ভাঙা পরিবারের সন্তান হিসেবে ওকে আনন্দহীন জীবনে ফেলে দেয়ার অধিকার কি আমার আছে, নাকি থাকা উচিত! একটা শিশুকে পৃথিবীতে আনলেই হলো? কী দায়িত্ব পালন। করতাম তার? খালি নিজেরটুকু ভাবি আমরা আনন্দ, বংশরক্ষা এবং শেষে মানবপ্রজাতির বেঁচে থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে আমরা প্রচণ্ড স্বার্থপর। নতুন প্রজন্মের জন্য কোনো ব্যবস্থা না করে যৌন সুখের তাড়নায় কিংবা অবলম্বনের অংশ হিসেবে সন্তানের কথা ভাবি। তোমার আর আমার দেশের অবস্থা একই তন্ময়। লন্ডনে শিশুদের জন্য কত কিছু–শত শত দোকান, জাদুঘর, পার্ক, কী নৈই ওদের জন্য–ওরাও ভাঙা পরিবারের সন্তান হয়, কিন্তু বস্তুগত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় না। রিজেন্টস রোডের হ্যামলিস একটি চমৎকার দোকান। খেলনা যে কত রকমের হতে পারে এখানে না এলে বুঝতাম না। গতকাল হ্যামলিসের নিচের তলায় স্ন্যাকস কর্নারে গিয়ে গ্লাভস, টুপি, মাফলার খুলে বসেছিলাম। কফি খেলাম অকারণে বসে থেকে সেইসব বাচ্চাদের দেখছিলাম। যারা বাবা-মায়ের সঙ্গে খেলনা কিনতে এসেছে, কিংবা শুধু বাবা অথবা শুধুই মা। বুকভরা কান্নায় আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না তন্ময়। আজ এ পর্যন্ত।

মাধবী কুটির চিঠি পড়ে তন্ময়ের মন ভারি হয়ে যায়। চিঠিটা ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দেয়। লেপ মুড়ি দিয়ে মাথা ঢাকার সঙ্গে সঙ্গে বারবারই মনে হয় ও নিজেও একটা পরিত্যক্ত শিশু। দরিদ্র জননী পালতে পারবে না বলে বিত্তশালী আর এক নারীর হাতে তুলে দিয়েছিল। বিধাতা ওকে ঠকায়নি, দুহাত পূর্ণ করে দিয়েছে। বঞ্চনার জীবন নয় ওর।

দুপুরের দিকে মাধবীর সঙ্গে দেখা

দুপুরের দিকে মাধবীর সঙ্গে দেখা হয় ওর। মাধবী চিঠির প্রসঙ্গ ওঠায় না, ও নিজেও বলে না। কেন, তা তন্ময়ের কাছে পরিষ্কার নয়, শুধু মনে হয় একটু লুকোচুরির খেলা চলুক, দেখা যাক কত দূর গড়ায়। মাধবী জিজ্ঞেস করে, কেমন আছ তন্ময়?

ভালো, তুমি?

আমিও ভালো।

ঠান্ডা তোমার কেমন লাগছে?

একদম ভিন্ন আমেজ। তোমার কাছেও তাই নিশ্চয়ই। কারণ আমরা কেউই এমন আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত নই। চলো তোমাকে নিয়ে একটা নতুন জায়গায় যাব।

কোথায়?

রিজেন্টস রোডের হ্যামলিস দোকানে।

কী আছে ওই দোকানে?

হাজার রকম খেলনা।

খেলনা দিয়ে আমরা কী করব?

আমি দুটো খেলনা কিনব। একটা তোমার জন্য, একটা আমার জন্য। খেলনাটি যত্ন করে সাজিয়ে রাখব ঘরে, ভাবব ওই খেলনাটা আমাদের শৈশবের সময়।

বাহ, বেশ আইডিয়া তো।

তাহলে চলো যাই হ্যামলিসে। দোকানের নিচে স্ন্যাকস কর্নার আছে, কিছু খেয়ে নেব ওখানে।

তারপরে? তারপর দুজনে রিজেন্টস পার্কে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে থাকব।

এই ঠান্ডায়?

তাহলে লেস্টার স্কয়ারে গিয়ে সিনেমা হলে ঢুকব।

তুমি দেখছি অনেক কিছু ভেবে রেখেছ।

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে পুরো সময়টা কাটাব বলে এভাবে ভেবে রেখেছি। তোমার পছন্দ হয়েছে প্রোগ্রামটা?

খুব পছন্দ হয়েছে।

জানি তুমি এটাই বলবে। এজন্যই তোমাকে আমার এত পছন্দ।

মাধবী কুট্টির চেহারা বেগুনি আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তুমি আর আমি একদিন ক্যামব্রিজে ঘুরতে যাব।

সারাদিনের জন্য, আমিও ভেবেছিলাম একাই একদিন ক্যামব্রিজের পথে বেরিয়ে পড়ব। ভালোই হলো যে তুমি সাথে থাকবে।

বাহ্, আমাদের মধ্যে টেলিপ্যাথি যোগ আছে।

মাধবী কুট্টির প্রাণখোলা হাসিতে মুগ্ধ হয় তন্ময়। মনে মনে ভাবে, ও যদি রোজ একটা করে চিঠি লেখে তাহলে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে করবে। এই অজানা শহরে একা একা বাস করার শূন্যতা ভরে উঠবে।

দুজনে হ্যামলিসে আসে। নানা উচ্ছাসে ঘুরে বেড়ায়। দুজনে দুটি খেলনা গাড়ি নিয়ে নেয়। কফি খায়, কিটক্যাট চকলেট কেনে। মাধবী তন্ময়ের হাত ধরে বলে, বেশ লাগছে, মনে হচ্ছে এখনই শৈশবে আছি, আমাদের সবচেয়ে ভালো সময়।

তন্ময়ের মনে হয় আজ ও নতুন করে মাধবীকে আবিষ্কার করবে, মানুষের ভেতরটাকে কখনো কখনো এমনভাবে দেখতে পাওয়া সুখী মানুষেরাই পারে। তন্ময় মাধবীকে বলে, আমি সত্যি একজন ভাগ্যবান। ছেলে, আমার যা হওয়া উচিত ছিল, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি, তোমাকেসহ মাধবী কুট্টি।

আমাকে সহ? মাধবীর কণ্ঠে বিস্ময়ের ধ্বনি।

তন্ময় মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ তোমাকেসহ, তোমার বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসার পূর্ণতা।

তন্ময়, তুমি কী করে বুঝলে আমাকে?

একটি চিঠি।

ওহ্ চিঠি!

চিঠি পেতে আমি খুব ভালোবাসি।

আমি তোমাকে রোজ একটি করে চিঠি লিখব।

লিখবে তো, লিখবেই।

আমি এই দোকানের সব চকোলেট কিনে ফেলতে চাই।

থামো। তন্ময় ওর হাত জড়িয়ে ধরে বাইরে নিয়ে আসে। বলে, সামনে ক্রিসমাস। আমরা সেই ছুটিতে ক্যামব্রিজ যাব। আর কদিন পরেই।

এভাবেই শুরু। প্রতিদিন তন্ময়কে চিঠি লেখে মাধবী। অনিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তন্ময়। বলে দেশে ও আমার অপেক্ষায় আছে।

একদিন দিনের প্রথম আলোয় তন্ময়ের দরজায় টুকটুক শব্দ করে মাধবী। উশকোখুশকো চেহারা। ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে তন্ময় বলে, কী হয়েছে মাধবী?

তুমি যখন অনিমার কথা বলো তখন আমার খুব কষ্ট হয়। কাল সারারাত এসব ভেবে আমি একটুও ঘুমুতে পারিনি তন্ময়।

আমি তো তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি না মাধবী।

আমি জানি, তুমি পারো না। তুমি তেমন ছেলে নও।

তুমি বসো, আমি কফি বানাই।

হ্যাঁ, কফি খেলে একটু ভালো লাগবে।

তন্ময়ের টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে মাধবী নিজেকে সামলায়। টেবিলের ওপর রাখা অনিমার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে বলে, তুমিই জিতেছ। তন্ময় তোমারই। তন্ময় কফি আর স্কটিশ কুকি এনে টেবিলে রাখে। মাধবীকে ভীষণ উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে, মাধবীর জন্য ওর খুব মায়াই হয়। ও নিজে কি এজন্য দায়ী? থমকে যায় তন্ময়। ওর আকস্মিক নিশ্চুপ হয়ে যাওয়াতে মাধবী অপরাধীর মতো বলে, আমি তোমাকে দুঃখ দিলাম তন্ময়?

ভাবছি, আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম কি না।

না, তুমি আমাকে কষ্ট দাওনি। আমিই তো বেশি এগিয়েছি, আমিই তো আমার আবেগ ধরে রাখতে পারিনি। আমি তোমাকে ভালোবাসি তন্ময়।

দুজনে ধীরেসুস্থে কফি শেষ করে।

কারো মুখে কথা নেই। মাধবী কুট্টি চামচ দিয়ে কাপের গায়ে টুংটুং শব্দ করে। বলে, আগামী শুক্রবার আমাদের ক্যান্টিনে বিশেষ খাবার। দেয়া হবে।

ভীষণ মজা, তন্ময়ের উৎফুল্ল কন্ঠ। পাঁচ পাউন্ডে দেয়া হবে টার্কি রোস্টের একটা টুকরা, ক্যানবেরি সস, আলুর সালাদ, রুটি, মাখন আর ক্রিসমাস পুডিং।

এই পুডিংটা খেতে আমার বেশি ভালো লাগে না।

তন্ময় চোখ বড় করে তাকিয়ে বলে, কেন?

পুডিং বললেও ওটা আসলে অনেক শুকনো ফল ঠাসা কেক, যার ওপরে কাস্টার্ড ঢালা হয়।

তন্ময় তার উৎফুল্ল ভাব না কমিয়েই বলে, আমার মনে হয় আমার। ভালোই লাগবে।

মাধবীর নিরুত্তাপ কন্ঠ, কেন?

উৎসবটা ক্রিসমাসের, সেজন্য। খাবারের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবেরও মজা আছে, তাই না?

মাধবী একটু চুপ থেকে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, তা ঠিক।

তন্ময় কন্ঠ আরো উফুল্ল করে বলে, চাঙ্গা হও মাধবী। স্কুল থেকে আমাদেরকে দেয়া হবে বেলুন, কাগজের টুপি, বাঁশি আরো কী কী যেন। সবটাই ফান, ভীষণ মজা। আমি কিন্তু তোমার সামনে আমার বেলুনটা ফুটিয়ে দেব। আর তুমি তখন হাততালি দেবে।

হ্যাঁ, বেলুন তো ফোঁটাবেই।

মাধবী খুব বিষণ্ন কণ্ঠে কথা বলে। ওর চোখের তারায় অদ্ভুত আঁধার, বিষণ্নতা যে বেদনার এমন প্রতিচ্ছায়া হতে পারে ও ভাবতেই পারে না। এমন দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা তন্ময়ের জীবনে নেই। ও বিমূঢ় হয়ে যায়। তখন মাধবী ওর ডান হাতটা ধরে বলে, আমি জানি আমার ভালোবাসার বেলুনটা তুমি ফাটিয়ে দেবে তন্ময়। তোমাকে ফাটিয়ে দিতেই হবে। কারণ, অনিমা তোমার অপেক্ষায় আছে।

আমি এত কিছু ভেবে তোমাকে এ কথা বলিনি। আমি ফান করার। জন্য বলেছি।

আমি সরি তন্ময়, আমার মনে হচ্ছে আমি তোমার কাছে একটু বেশি চাইছি।

মোটেই না। তুমি আমার ভীষণ ভালো বন্ধু।

বন্ধু! মাধবী বিড়বিড় করে বলে। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলো যাই।

ঘরে ফিরতে চাই না। তন্ময় উঠতে উঠতে বলে।

আমি তো ঘরে ফিরব না। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে যাব। ক্রিসমাসের জন্য দারুণ সাজিয়েছে জায়গাটা। তুমি যাবে

যাবই তো। তন্ময় মাধবীর বিষণতা কাটাতে চায়। ওর ঘাড়ে হাত রেখে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দুজনে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলে করে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে আসে। আলো ঝলমলে শহরটা স্বপ্নপুরীর মতো লাগছে। তন্ময় মাধবীর ঘাড়ে চাপ দিয়ে বলে, ওয়াও, দারুণ তো!

দোকানে দোকানে কী ভীষণ ভিড় দেখেছ?

হুঁ, আমি ভাবছি তোমার জন্য একটা পারফিউম কিনব।

ক্রিসমাস গিফট?

অবশ্যই।

আমিও তোমার জন্য গিফট কিনেছি কুট্টি।

কবে? কখন?

বলবো না। ক্রিসমাসের রাতে দেব। ম্যাথুর দোকান থেকে আমি তোমার জন্য পরীর লকেট কিনেছি। সঙ্গে রুপালি চেন। তোমার ক্রিসমাস স্কার্টের সঙ্গে দারুণ মানাবে।

মাধবী ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। ওর চোখ জলে ভরে যায়। দ্রুত দুহাতে চোখের জল মুছে ও ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। এত অকস্মাৎ ঘটনাটি ঘটে যে তন্ময় ভিড় ঠেলে মাধবীর হদিস করতে পারে না। নিজেও ভিড়ের মধ্যে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের গুতো খেতে খেতে এগোতে থাকে। ও কোন দিকে যাচ্ছে ও নিজেও জানে না। জনস্রোতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ওর ভালোই লাগছে। মনে হয় অবসর কাটানোর এমন সুযোগ জীবনে কমই আসে।

দুদিন পরে নীলিমা চোখ বাঁকিয়ে বলে, মাধবীর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে?

বন্ধুত্ব হয়েছে, তবে ম্যাথুর সঙ্গে তোমার যেমন বন্ধুত্ব, তেমন নয়।

নীলিমা হাত ওলটায়। কঠিন স্বরে বলে, তোমার কথা বেশ শার্প হয়েছে।

তোমাকে থ্যাঙ্কু নীলিমা, তোমার মতো কথা বলা শিখতে পেরেছি এটা আমার কৃতিত্ব, কী বলে?

নীলিমা কটমট করে তাকায়। হো-হো করে হাসে তন্ময়।

রাগ করছ কেন?

তোমার সঙ্গে রাগ করতে যাব কেন? ম্যাথু কেমন আছে?

জানি না।

মানে?

সহজ কথার মানে বোঝ না? ম্যাথুর খবর আমি জানি না। ওর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই।

ও বাব্বা! গতকালই ম্যাথুর সঙ্গে আমার দেখা হলো। খুবই হাসি-খুশি ছিল। ভাবলাম তোমরা দুজনে হেভি আছ।

তুমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করোনি?

আমি অন্যের প্রাইভেসিতে নাক গলাই না।

ও আচ্ছা, যাচ্ছি। বাই।

নীলিমা চলে গেলে তন্ময় অবাক হয় না। ম্যাথুকে একজন দারুণ মজার লোক বলে মনে হয়। একটা সম্পর্ক গড়ে অল্প দিনে ভেঙে দিয়ে বেশ আছে। অদ্ভুত মানুষ। আর ও নিজে অনিমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। তাহলে ও কি ওল্ড ভ্যালুজের লোক? আধুনিক হতে পারেনি? তন্ময়কে বিষয়টি খুব ভাবায়। এই ভাবনায় দুদিন কেটে যায়। পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলে ঘরের মেঝেতে পায় মাধবীর চিঠি, দরজার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। খামের ওপরে লিখেছে, তন্ময় চিঠিটা মাকে পাঠিয়েছি। তোমাকেও পড়ার জন্য দিলাম। কফি বানিয়ে টেবিলে এসে ল্যাম্প জ্বালিয়ে চিঠি পড়তে বসে তন্ময়।

প্রিয় মা,

তোমার ভাষায় আমি তোমার নষ্ট মেয়ে, ঠিকমতো মুরব্বিদের সঙ্গে আচরণ করতে শিখিনি। এটা তুমি ভাবতেই পারো, বিষয়টি বোঝাতে তুমি যে ইংরেজি শব্দটি ব্যবহার করে তা হলো ভ্যালুজ। তোমরা এক ধরনের ভ্যালুজ নিয়ে বড় হয়েছ মা। আমরা আর এক ধরনের। এমনটা তো হতেই হবে, না হলে মনে হবে সময় চলছে না। কিন্তু আমার গড়ে ওঠা ধারণাকে তুমি অবক্ষয় বলে সংজ্ঞায়িত করো। আমি তোমার এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছি মা। সেজন্য তোমার কাছে আমি খারাপ। ঠিকমতো শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হইনি। আমাকে তুমি ভালোভাবে বড়ই করতে পারোনি। কিন্তু মা, মূল্যবোধের অর্থ যদি হয় নিজেকে বঞ্চিত করা, নিজের সাথেই হিপোক্রেসি; তাহলে সে মূল্যবোধ ক্ষয়ে যাওয়াই ভালো। প্রশ্ন হতে পারে, আমরা কেন নিজেদের এত ভালোবাসি, আসলে প্রশ্নটা ভুল জায়গায় হলো না, প্রশ্নের উত্তরও আমিই তোমাকে দেব। আসলে বিষয়টা হলো আমরা নিজেদের চাওয়া-পাওয়া, নিজেদের ভালোবাসা তোমাদের মতো করেই করি। পার্থক্য হলো আমরা বলে-কয়ে করি, অন্যায় করলে সেটা স্বীকার করতে দ্বিধা করি না, বলতে চাই আমরা যা আমরা তা, আমাদের লুকোছাপা নেই। তোমাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই মা, যে সংকীর্ণ সংজ্ঞা দিয়ে নিজের বিশাল পৃথিবীটাকে ম্যাচ বাক্সে পুরে ফেলতে চাই না–সেজন্য নিজেকে জাতি-রাষ্ট্রের বাইরে নিয়ে যেতে আমার কোনো সমস্যা হয় না। এ এক অন্য সময়ের কথা মা। এ সময়কে যদি তুমি ধরতে না পারো তবে নিজেই পিছিয়ে পড়বে, নিজের মেয়ের সঙ্গেই সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হবে। তুমি হারাবে আমার বয়সী প্রিয়জনদের। তুমি তোমার সময়কে আমাদের ঢুকিয়ে দিতে চেও না। শুধু শুধু কষ্ট পাওয়া বাড়াবে, বিনিময়ে নিজেকে একা হয়ে যেতে দেখবে। আমি জানি আমাকে নিয়ে তোমার ভাবনার অন্ত ছিল না। অনেক রাত তুমি না ঘুমিয়ে কাটাতে। কী দরকার অংক কষার মা? সিস্টেম থিওরিতে কিন্তু আছে দুই আর দুই যোগ করলে হয় পাঁচ কিংবা ছয়, আবার তিনও হতে পারে। সুতরাং তুমি আমাকে বুঝতে চেয়ো না, বরং অনুভব করো। নিজের জীবনকে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ধরার খেলা আমি শিখেছি মা। আমরা তো আমাদের জীবনের নানা ধারণার সংজ্ঞা বদলে ফেলেছি। জীবনকে খাঁচায় রেখে রঙ দেখা, ঝালাই করা, ছুঁড়ে ফেলা, কাছে টানা কিংবা চরম উদাসীনতা বা বৈরাগ্য নিয়ে বেরিয়ে আসার পরীক্ষা কেন্দ্রে আমি নিজেই নিজের গিনিপিগ। মা, সেখানে তুমি সনাতনী সুখী দাম্পত্য চেহারাটি আমার পাবে না। কিন্তু

পাবে আমার ভিন্ন সত্তা, যে সত্তা নিজের মতো করে গৃহকোণ সাজায় ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিতে। কিন্তু তোমাদের কাছে মেয়েদের এই চেহারা পছন্দের না। তোমরা ভালোবাসো নরমসরম–বোকা সেজে থাকা মেয়েদের। মেয়ে হবে কিন্তু ন্যাকামি করবে না, আবদারে গলে যাবে না, এ কি মেনে নেয়া যায়। এ ছাড়া আমাদের আর কোনো আইডেনটিটি কি নেই? আমরা একজন মানুষ, কিন্তু স্বতন্ত্র, বলতে পারো মা স্বতন্ত্র মানুষের শিক্ষা আমরা পরস্পরকে কবে দিতে পারব? যেখানে মেয়েরা বিকোয় তার জন্মসূত্রে পাওয়া লিঙ্গের ওজনে, সেখানে তো পরিবর্তনের আশা খুবই ক্ষীণ। তারপরও আমি বিপুল প্রত্যাশায় যুদ্ধে নেমেছি। নিজের সাথেই নিজের যুদ্ধ। এ খেলায় আমি হেরে যাব না। কারণ আমার কাছে হারা বা জেতা ভোটে যাচাইয়ের মতো ব্যাপার নয়। আমার দেখার বিষয় গুণের দিক। পরিমাণের দিক নয়। তাই নিজেকে সবসময় জিতিয়ে রেখে গুণের ভার বাড়ানো আমার লক্ষ্য। তবে তুমি জানো মা, জিতিয়ে রাখার ক্ষমতা অর্জন করার পথটা একদমই সহজ নয়। তবু অক্লান্ত চেষ্টার পথের যাত্রী হতে চাই।

তবে মাঝে মাঝে খুব ভেঙে পড়ি। ভেতরটা ভেঙে গুড়িয়ে যায়। বিশেষ করে যখন বৃষ্টি পড়ে। বুকের ভেতর উথালপাথাল করে, পাগল পাগল ভাব তড়পায়। এত জল ধারণ করার শক্তি কোথায় পাব বলো!

মাঝে মাঝে ভাবি কোথায় বিলং করি আমি। কখনো নিজেকে আন্তর্জাতিক ভাবি। আবার যখন দেখি নিজের দেশের সমস্যা তখন ক্রোধ জন্মায়, চিৎকার করি এই মুহূর্তে ভিন্ন দেশে বসবাস করার হীনম্মন্যতায় কুঁকড়ে আছি। ভাবি, কী আমার অধিকার এই দেশের মাটির কাছে! তখন মানসিক পীড়নে বিপর্যস্ত হয়ে ভাবি, আমি কোথাও বুঝি বিলং করি না। সুতো কাটা ঘুড়ির মতো হুস করে উড়ে যাই। উড়তে থাকি, নিজের প্রতি প্রবল মমতায় নিজের অবস্থানকে শক্ত করতে চাই। এই যে অজানা গন্তব্যে যাওয়ার বাসনা, সে এক প্রবল আনন্দ হয়ে টানে। মা তুমি ছকবাঁধা জীবনের ভেতরে থেকে কখনো এই গতির দেখা পাওনি।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ছেলে তন্ময় আমার ভীষণ ভালো বন্ধু। মা, ওকে পেয়ে আমি নিজের অনেকটুকু সামলে নিয়েছি। তবে আমি এটাও জানি যে, ও আমার জীবনের শেষ

কথা নয়। ওকে নিয়ে এই আনন্দদায়ক সময়ও আমার সময়ের ক্রান্তিকাল সময়কে হেয় করার অভিযান। যদি এই সময় আমার জীবন থেকে ঝরে যায় তবে দুঃখ পাব না মা। আমি নিজেকে অতিক্রম করতে শিখেছি।

আমার জন্য একটুও ভেব না।

তোমার মেয়ে, কার্টরাইট গার্ডেন, লন্ডন, ২১ আগস্ট।

তন্ময় চিঠিটা ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দেয়। মাধবীকে মোবাইলে ফোন করে পেল না। ফোনটা প্রতিবারই বেজে বেজে থেমে গেল। রাতে ঠিকমতো ঘুমুতে পারল না তন্ময়। বারবার ঘুম ভেঙে গেল ওর।

পরদিন মাধবীকে কোথাও দেখতে পেল না, পরদিনও না।

বিকেলে মাকে ফোন করল তন্ময়।

মাগো মনে হচ্ছিল কত দিন যে তোমার সঙ্গে কথা বলিনি। তুমি কেমন আছ মা?

সাবিহা বানু ওর কথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়।

তুই কেমন আছিস সোনা?

খুব ভালো আছি মা।

তোর বাবার বন্ধু সালামত মিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলি?

করেছিলাম মা। তবে ওদের জন্য আমার দুঃখই হয়েছে। দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকেও ওদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি মা। এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে এ দেশে এসে

ওরা একই সময়ের গণ্ডিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হয়েছে ওদের রয়েছে কালচারাল শক। ভাষার দূরত্বসহ আরো অনেক কিছু ওদের গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছে।

তোর এসব অবজারভেশন ডায়রিতে লিখে রাখিস বাবা। তোর সঙ্গে কারো বন্ধুত্ব হয়নি?

তোমাকে তো ম্যাথুর কথা বলেছিলাম। ইদানীং মাধবী কুট্টি নামে ভারতের কেরালার একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। ও আমার সঙ্গেই ফটোগ্রাফির কোর্স করছে।

ও আচ্ছা। সাবিহা বানুর কণ্ঠ দমে যায়।

তন্ময় সোৎসাহে বলে, জানো মা ও না একটা দারুণ মেয়ে। দেশে পরিবারের সবার কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেয়ে ঘর ছেড়েছিল, পরে দেশও। বলে, আর কোনো দিন দেশে ফিরবে না।

এসব সাময়িক কথা বাবা, ঠিকই দেশে ফিরবে। নিজের দেশে না ফিরলেও দেশের কথা মনে রাখতে হবে। নইলে তো ও শেকড়হীন হয়ে যাবে।

হো-হো করে হেসে তন্ময় বলে, তোমার কাছ থেকে এসব কথা শুনলে মাধবী বলবে, তুমি একদম ওর মায়ের মতো কথা বলছ। অর্থাৎ তোমরা একই জেনারেশনের মানুষ।

তা তো হবোই। তবে একই জেনারেশনের সব মানুষ কিন্তু একই সুরে কথা বলে না। তুই নিজে কি মাধবীর মতো ভাবিস?

সবটা ওর মতো ভাবি না। তবে আমার উত্তর শুনে ও বলবে তুমি পুরুষ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক পার্থক্য। তোমরা সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ।

এটা ও ঠিকই বলে।

মায়ের কথা শুনে আবার হো-হো করে হাসে তন্ময়। বলে, তুমি মাধবীর দলে চলে গেলে মা।

সাবিহা বানু হেসে বলে, কোনো কোনো জায়গায় নারীদের সবার ভাষা একরকম হয়ে যায়। ব্রিটিশদের তোর কেমন লাগছে রে?

ওদের আমার অদ্ভুত লাগে মা। ওদের আছে শুধুই বেঁচে থাকা। মনে হয় ওরা বুঝি শুধুই বেঁচে থাকার জন্য আছে। কেন বাঁচতে হবে এ প্রশ্ন ওদের নেই। জীবনদর্শনহীন ক্রমাগত ছুটতে থাকা চারপাশের ব্রিটিশদের দেখে আমার করুণাই হয়।

হায়রে ছেলে, তোর এমন অভিজ্ঞতা হবে আমি ভাবতে পারিনি।

দুঃখ পেয়ো না মা। তুমি ভালো আছ তো?

হ্যাঁ, ভালোই আছি। তুই ভালো থাকবি। তোর ফেরার অপেক্ষায় আছি।

ফোন রেখে দেয় দুজনে। ফোন বুথের গায়ে হেলান দিয়ে হঠাৎই ওর মনে হয় লন্ডনে ওর আর ভালো লাগছে না। কোর্সটা শেষ না করেই ওর চলে যাওয়ার ভাবনা মাথায় আসে। এটা করলে মা কি রাগ করবে? তন্ময় ধীরেসুস্থে বের হয়ে ভাবে, ম্যাথুর কাছে গিয়ে আড্ডা দিলে ওর ভালো লাগতে পারে। ও বিশ মিনিটের রাস্তা হেঁটেই চলে যায়।

দূর থেকে ম্যাথু আর নীলিমাকে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে গল্প করতে দেখে ও খুশি হয়ে যায়। বুঝে ফেলে যে কোনো কারণে দুজনের ঝগড়া হয়েছিল, সেটা মিটে গেছে। ওর দিকে চোখ পড়তেই দুজনে হাত নাড়ে। তন্ময় কাছে গিয়ে সোজাসুজি নীলিমাকে বলে, মিলনের উৎসব পালন করে ফেল। ম্যাথু তো দোকান থেকে নড়বে না, যাও নান্দোস থেকে খাবার নিয়ে এসো।

এসেই একদম হুকুম জারি করছ?

করব না, এমন দৃশ্য দেখার ভাগ্য কজনের হয়?

ম্যাথু অবাক হয়ে বলে, কী হয়েছে?

তেমন কিছু না। নীলিমাকে খাওয়াতে বলেছি।

খুব ভালো করেছ। ম্যাথু ওর টেবিলের ড্রয়ার থেকে বিশ পাউন্ড বের করে বলে, আমি যাচ্ছি। তোমরা আমার দোকান সামলাও।

তন্ময় ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, ভাবতে অবাক লাগে যে এই মানুষটা ঝগড়া করতে পারে।

নীলিমা খোঁচা দিয়ে বলে, পুরুষ মানুষ যে কী চিজ তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাই।

ঢালাও মন্তব্য করো না নীলিমা। নইলে তুমি ম্যাথুর কাছে আবার আসতে না।

আসিনি, পায়ে ধরে এনেছে।

তন্ময় হো-হো করে হাসে। বলে, দেবীদের তো পায়ে ধরতেই হয়। যাকগে, মাধবী কোথায় উধাও হলো বলো তো?

ও তো ক্যামব্রিজে গেছে। ওর এক বান্ধবী থাকে ক্যামব্রিজের কাছে কোনো একটা জায়গায়, আমি ঠিক জানি না। আজকালের মধ্যে ফিরবে।

তন্ময় মনে মনে চুপসে যায়। মাধবী ওকে না বলে ক্যামব্রিজে চলে গেল! যাকগে, যেতেই তো পারে। ওকে বলে যেতে হবে কেন মাধবীর? ও তো অনেকবারই বলেছে, আমি কোথাও নেই। আমি বলি আমি আমিই। কারো নই। কোথাও নেই। এভাবেই আছি, এভাবেই থাকব। নিজের সঙ্গেই আমার নিজের বোঝাপড়া। নিজের সাথে ঝগড়া এবং বাকি যা আছে তার সবটুকু। একদমই নিজের ভেতর ঢুকে যাওয়া। অথচ যখন বাইরে

তাকাই তখন পৃথিবীটাকে অপূর্ব লাগে, তখন নিজেকে সবটুকু আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে ফেলতে আমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এখন আমি সেকেন্ড সিঙ্গল। দ্বিতীয় বার একা হয়ে যাওয়া এই জীবনটা নিয়ে আমার দুঃখ নেই।

নীলিমা খোঁচা দিয়ে বলে, কী ভাবছ? মাধবীর কথা?

যদি ভাবি, তাহলে কি তুমি জেলাস হবে? ওই দেখো কাস্টমার। ভারি সুন্দর মেয়ে দুটো।

চোখ লাগিও না।

তন্ময় উত্তর দেয়ার আগেই মেয়ে দুটো টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। লকেটগুলো দেখতে দেখতে উচ্ছ্বসিত হয়। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে গোটা দশেক লকেট পছন্দ করে এবং কিনে ফেলে। তন্ময় খুশি হয়ে বলে, তুমি দেখছি লাকি দোকানদার।

ম্যাথু খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাবে।

ওই দেখো আরো দুজন আসছে। তোমার ভাগ্য যে এত ভালো ম্যাথু কি তা জানে!

নীলিমা ওর কথায় কান দেয় না। খদ্দেরের দিকে নজর দেয়, কত কিছু যে যত্ন করে দেখায় তার ঠিক নেই। কে বলবে নীলিমা মাত্র ক'মাস ম্যাথুর এই দোকানটা চেনে। ওদের কথা বলার ফাঁকে তন্ময় বেরিয়ে আসে। মেলার এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায় উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীনভাবে। সন্ধ্যার পরে একা একা নান্দোসে বসে ঝাল চিকেন খায়। আজ সেই পর্তুগিজ ছেলেটি নেই। মন খারাপ হয়ে যায়। ঝালে চোখে জল এলে কেউ এক টুকরো মিষ্টি এগিয়ে দেয় না। ঘরে ফিরে লেটার বক্স চেক করে মাধবীর চিঠি পায়। দ্রুত তালা খুলে আলো জ্বালায়। চমৎকার একটি খাম এবং চমৎকার কাগজ ব্যবহার করেছে ও। সুগন্ধি আসছে কাগজ থেকে। লিখেছে, প্রিয় তন্ময়, রাইসন থেকে তোমাকে লিখছি। আমি জানি চিঠি পেতে তুমি খুব ভালোবাসো। কিংসক্রস স্টেশন থেকে একটা স্টেশন পরেই রাইসন। এখানে আমার বান্ধবী কমলা থাকে। আমার

বিয়ের আগেই ওর বিয়ে হয়েছিল একজন ব্রিটিশ ডাক্তারের সঙ্গে। তারপর থেকেই কমলা রাইসনে। ওদের বাড়িটা ছোট, বেশ নিরাভরণ এবং নিজের মতো করে ছিমছাম করে সাজানো। বাড়িতে বাড়তি কোনো বাহুল্য নয়। মনে হয়েছিল বাড়িটা বুঝি আমারই, আমার বাড়ি হলে আমি বোধহয় এভাবেই রাখতাম। এই ধারণা পেয়েছি বলেই দুদিন থাকব বলে এসে সাতদিন পার করে দিচ্ছি। কমলার স্বামী দিলীপ অফিসের কাজে ফ্রান্স গেছে। দু'বন্ধুর সময় দারুণ কাটছে। দুদিন আগে আমি আর কমলা একটি বুনো আঠে হাঁটতে গিয়েছিলাম। খুব মজা পেয়েছি সেই মাঠে হেঁটে। আমাদের দেশের মতো সাধারণ মাঠ নয়। মাঠটি পাহাড়ের উপরে, ছোটবেলায় ভূগোল বইয়ে যে মালভূমির কথা পড়েছিলাম, এটা সেই মালভূমি। এই মাঠের যে বৈশিষ্ট্য আমার নজর কেড়েছে সেটা একটি কাঠের বেঞ্চ। ছোট পাহাড়, উঠতে তেমন কষ্ট হয় না। মাঠের শেষ প্রান্তে যেখানে পাহাড় খাড়া হয়ে নেমে গেছে ঠিক সেখানে দিগন্ত দেখার জন্য বেঞ্চটা রাখা। ওই বেঞ্চটা তোমার মতো কাউকে নিয়ে বসার জন্য তন্ময়, অবশ্য কমলার সঙ্গে বসা যায় না, তা নয়, কিন্তু তারপরও বুকের মধ্যে ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে। আমার সঙ্গে কমলাও স্বীকার করল যে, ভালোবাসার জন্য যে কারো কাছেই নতজানু হওয়া যায়, যদি সে সম্পর্কে ব্যক্তিত্বের অবমূল্যায়ন না হয়। আমাদের ছেলেরা জানে না ছেড়ে দেয়া পাখির ভালোবাসার গভীরতা বন্দি পাখির আর্তনাদে কখনো পাওয়া যায় না। খাঁচার পাখিই পালানোর সুযোগ খোঁজে এবং সুযোগ পেলে পালিয়ে যায়। ভেবে দেখো পালানোর কনসেপ্ট স্বাধীন পাখির নেই। পরিস্থিতি বিরূপ হলে ও অনায়াসে ঘোষণা দিয়ে সরে যেতে পারে। কমলা আমাকে বলল, দূরের দিকে তাকিয়ে দেখ। সামনের ঘরবাড়ি ফোঁটা ফোঁটা জলের মতো দিগন্তের কাছে জড়ো হয়েছে। ভাবলাম ফোঁটা ফোঁটা জল কি সমুদ্র হয়, নাকি হাওয়ায় উড়ে যায়? সামনে বনের গাছগুলো দিগন্ত পর্যন্ত সবুজ করে রেখেছে। নিচে যত দূর চোখ যায় দেখতে পাচ্ছি শর্ষে ক্ষেতের সোনালি আভা, আমাকে অভিভূত করে এমন অপরূপ দৃশ্য ভুলে যেতে চাই ক্ষণিকের দুঃখ, দুঃখ যেন আমাকে গ্রাস না করে তার প্রতিজ্ঞা করি। এই অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ কে এঁকে রেখেছে। আমার কোনো প্রিয় শিল্পী কি? তন্ময় এখানেই শেষ করছি। বারবারই মনে হচ্ছে ওই বেঞ্চে তোমার সঙ্গে বসে যদি ল্যান্ডস্কেপটা দেখতে পেতাম! তন্ময় এভাবে নতুন দুঃখ তৈরি হয়। ভালো আছি। রাতে আমরা দুজনে টুনা ফিশের স্যান্ডউইচ খাব। সঙ্গে সালাদ আর রাইস পুডিং। ভালো থেকো। মাধবী।

চিঠিটা পড়ে তন্ময়ের মন খারাপ হয়ে যায়। ওর আবার মনে হয়। কোর্সটা শেষ না করেই চলে যাওয়া উচিত। ওর আর এখানে ভালো লাগছে না। অনিমাকে একটা চিঠি লিখবে বলে কাগজ নিয়ে বসে। কিন্তু লেখা হয় না, আঁকিবুকি কাটে, অনিমার মুখ আঁকে, নিজেকেও আঁকে এবং লন্ডনের বিভিন্ন রাস্তা, টিউব স্টেশনের নামে লিখে ইতি টানে। নিজের খোলা কতগুলো ছবি দিয়ে খামের মুখ বন্ধ করে। এখন পর্যন্ত অনিমার কোনো চিঠি পায়নি। ওর চিঠি কি অনিমা একটাও পায় না? এত কিছু ভাবনার মধ্যেও ওর চমৎকার ঘুম আসে এবং অনিমার হাত ধরে একটি শর্ষে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এমন স্বপ্ন দেখে।

ভোরে স্কুলেই মাধবীর সঙ্গে দেখা হয়। মাধবী দূর থেকে হাত নাড়ে। সামনাসামনি কথা হয় না। ক্লাস শেষের পরে বলে, চলো সোয়াসের ক্যান্টিনে গিয়ে লাঞ্চ করব। আমার চিঠি পেয়েছ?

পেয়েছি। দারুণ লিখেছ। এমন ল্যান্ডস্কেপের ছবি তুলতে পারলে ভালো লাগত।

দারুণ মিস করেছ। তবে ক্যামব্রিজে ঘোরা আমার ভীষণ আনন্দের হয়েছে। ক্যামব্রিজের মাঠটা দারুণ সুন্দর। নদীর নাম ক্যাম। ওর ওপরে যে ব্রিজটা আছে সেজন্য নাম ক্যামব্রিজ। সুন্দর না?

ভীষণ সুন্দর।

তুমি যদি যেতে চাও তাহলে তোমাকে নিয়ে আমি আবার যাব।

তন্ময় চুপ করে থাকে। আকস্মিকভাবে ওর সব আগ্রহ উবে যায়। ক্যান্টিনের ভেতরে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় জমে উঠেছে। দুজনে খুঁজেপেতে দুটো চেয়ার খালি পায়। মাধবী কুট্টি তন্ময়ের পরিবর্তন খেয়াল না করেই বলতে থাকে, ক্যামব্রিজের কুইন্স কিংস, ট্রিনিটি, কপার্স, ক্রিস্টি কলেজগুলো দেখেছি। স্থাপত্য শিল্প আমাকে মুগ্ধ করেছে। কত শত বছর আগে মানুষ কী করে যে ওসব নির্মাণ করেছে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারি না।

চলো খাবার নিয়ে আসি।

চলো। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায় মাধবী। তন্ময়ের মনে হয় মাধবী নিজের মধ্যে বেশ মগ্ন হয়ে আছে। পরক্ষণে ও নিজেকে সোজা করে নেয়, জীবনের প্রতি মাধবীর দৃষ্টিভঙ্গিই তো এমন। ও সময়কে অতিক্রম করবে। কোনো সময় ওকে কাবু করতে পারবে না–এই মাধবী, এমনই মাধবী কুট্টি। খাবার নিয়ে এসে দুজনে আবার মুখোমুখি হয়। মাধবী নিজের কথা বলার জন্য খাবারসহ চামচটা মুখের কাছে উঠিয়ে আবার প্লেটের ওপর নামিয়ে রাখে। বলে, একটা প্রশ্ন নিয়ে আমি নিজের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি তন্ময়।

তন্ময় ওর উত্তর শোনার জন্য তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন করে না। মাধবী এক চামচ ভাত মুখে পোরে। বলে, একদিন সন্ধ্যাবেলা কিংস কলেজে গিয়েছিলাম। কমলা আমাকে কলেজের চ্যাপেলে প্রার্থনা সংগীত শোনার জন্য নিয়ে ঢুকল। কন্ঠস্বর আর অর্গানের যৌথ শব্দ অপূর্ব ধ্বনির সৃষ্টি করে চ্যাপেলের ভেতরে। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কত বছর আগে তৈরি হয়েছে ওই চ্যাপেল কে জানে। কিন্তু পুরনো জিনিসের অনাধুনিকতা। কোথাও পেলাম না। আমরা দুজনে দেড় ঘন্টা বসে গান শুনলাম। লম্বা সাদা পোশাক পরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন বয়সী ছেলেরা গান গাইছে। তো শ'খানেকের মতো। কন্ঠের ওঠানামায় সুরের রেশ আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে হলো সময়টি আমাকে নিজেকে অতিক্রম করতে সাহায্য করছে। আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পাই চ্যাপেলের দেয়ালজুড়ে বিশাল জানালাগুলোর রঙিন কাচে যিশুর জীবনের বিভিন্ন সময়ের ছবি আঁকা। রঙের গাঢ়তা লক্ষণীয়। যেমন গাঢ় লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, কালো আর সাদা। এ অল্প কয়েকটি রঙের ব্যবহারে যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনা হয় না। মনে হচ্ছিল প্রতিটি ছবির দৃশ্যগুলো এই কিছুক্ষণ আগে ঘটেছে, কিংবা হয়তো কিছুক্ষণ পরে ঘটবে। আলো, রঙ, সুর এবং বাদ্যের মূর্ঘনায় কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যাচ্ছিল টের পাইনি। চ্যাপেলের ভেতরে বসার জন্য সারি সারি বেঞ্চের ওপর যে গানগুলো গাওয়া হচ্ছিল তার একটা করে বই রাখা ছিল। গানের আবেশ কেটে যেতে একটুখানি ধাক্কা খেলাম। বইটি উঠিয়ে নিয়ে গানের বাণীতে চোখ পড়তেই মনটা বিষাদে ভরে গেল। রক্ষণশীলতায় ভরপুর গানের বাণী। তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো তন্ময়, রক্ষণশীলতার সংজ্ঞা কী? তুমি বলতে পারো, তোমার ধর্মীয় বিশ্বাস আর

একজনের কাছে রক্ষণশীল হবে কেন? এসব নিয়ে তর্কবিতর্ক হতে পারে। কিন্তু আমার খারাপ লেগেছে অন্য বিষয়ে।

এই বলে মাধবী কুট্টি থামে। দু-চামচ ভাত খায়। ওর চেহারায় ভিন্ন। আলো খেলা করে। মাধবীর এমন চেহারা তন্ময় আগে দেখেনি। ও তখন নিজের থেকেই বলে, বাকিটুকু বলো।

এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে ক্যামব্রিজে পড়া ছেলেমেয়েরা সন্ধেবেলায় রাজার কাছে মাথা নত করার কথা সুর করে বলে বেড়ায়। মধ্যযুগীয় ধর্মকে বদলানোর সাহস এখন পর্যন্ত কারো হয়নি। সে রাতে রাইসনে ফিরে পরদিন আমি ট্রেনে করে লন্ডনে ফিরে আসি।

বেশ এক্সসাইটিং অভিজ্ঞতা।

তোমার তাই মনে হচ্ছে?

অবশ্যই হচ্ছে। আমিও তোমার মতো ভাবছি। নিজের দেশেও ধর্মের অপব্যাখ্যা শুনতে পাই ধর্মান্ধদের কাছে। ওরা প্রয়োজনে ধর্মকে হাতিয়ার করে।

এ রাজনীতি আমার দেশেও আছে নয়। এসো ভাত শেষ করি।

খাওয়া শেষ হলে তন্ময় বলে, আমি ঠিক করেছি কোর্সটা শেষ করব না। দেশে ফিরে যাব।

ভ্রু কুঁচকে মাধবী চেঁচিয়ে বলে, বাজে কথা বলছ কেন?

বাজে কথা নয় মাধবী। আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।

আমি চাই, আমার জন্য তুমি কোর্সটা শেষ করবে। এটা আমার দাবি।

মাধবী বাম হাত দিয়ে তন্ময়ের বাম হাতটা চেপে ধরে।

আজ রাতে আমি অনিমাকে চিঠি লিখব।

লেখো, আমার কথাও লিখো কিন্তু।

এখন মাকে ফোন করলে তোমার কথা আসে, অনিমাকে চিঠি লিখলে তোমার কথা আসে।

দারুণ! মাধবী খিলখিল হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে আশপাশের টেবিল থেকে অন্যরা ওদের দিকে তাকায়। তন্ময় মগ্ন কণ্ঠে বলে, তুমি আমায় অনেকটা বদলে দিয়েছ মাধবী কুট্টি।

মাধবী ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে প্লেটের শেষ ভাতটুকু চামচে তুলে মুখে পোরে। ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে বলে, জানো দেশে একবার এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে চমকে উঠেছিল। বলেছিল, ত্রিভুজ মানে সুখ আর চতুর্ভুজ মানে দুঃখ। তোমার হাতে চতুর্ভুজ বেশি। আমি তার কথায় একটুও ঘাবড়াইনি। তবে ত্রিভুজগুলো জোড়া লেগে সব চতুর্ভুজ হয়েছে। কী পাগলামি দেখ তো! নিয়তি মানি না আমি। নিয়তি যতই আমার সামনে দেয়াল ওঠাবে আমি আমার সাহসের কুড়াল দিয়ে সেই দেয়াল ভাঙব। পারব না?

পারবে মাধবী, পারবে। আমি তোমার সাফল্য কামনা করছি।

চলো যাই।

দুজনে ট্রেসহ প্লেটগুলো উঠিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে বেরিয়ে আসে। দেখতে পায় ম্যাথু আর নীলিমা ক্যান্টিনে ঢুকছে। খানিকটুকু দূরে বলে তন্ময় হাত নাড়ে, ওদিক থেকে ম্যাথু হাত ওঠায়। নীলিমা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। মাধবী এসে বলে, নীলিমা চায় না যে তুমি আমার সঙ্গে মেশা।

অন্যের চাওয়া-না চাওয়ায় আমার কী এসে যায়। সোয়াসে যখন এসেছি, এখান থেকে মাকে একটা ফোন করব। তুমি একটু দাঁড়াবে?

চলো আমি একটা বুথে ঢুকে কমলার সঙ্গে কথা বলি।

একটা রিং বাজতেই সাবিহা বানু ফোন ওঠায়। তন্ময় উচ্ছ্বসিত হাসিতে বলে, মা তুমি বুঝি জানতে যে আজ তোমার সোনালি ঈগলটা ফোন করবে, তাই ফোনের কাছে বসে ছিলে?

ঠিক বলেছিস।

জানো মা, আমার ধারণা দেশে ফিরলে তুমি ঠিকই টের পাবে যে তোমার ছেলে অনেকখানি বদলে গেছে।

তাই? এ আমার কাছে খুশির খবর।

মাধবীর সঙ্গে মিশে আমি অনেক নতুন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ওর কথা শুনলে মনে হয় আমার সামনে একটা পথ খুলে যাচ্ছে।

মাধবীর দেশে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছি তোর জন্য। দিল্লিতে ফটোগ্রাফির ওপর একটা ওয়ার্কশপ হবে। আমি তোর যাবার ব্যবস্থা করেছি। তুই ফিরলেই যেতে পারবি।

ওহ মা, সোনা মা আমার।

লাইন কেটে যায়। বুথ থেকে বেরিয়ে দেখতে পায় অন্য কোনো বুথে মাধবী নেই। ও চলে গেছে। কখন গেল? তন্ময় হেঁটে ঘরে ফেরে। কফি খেয়ে চিঠি লিখতে বসে।

প্রিয় অনিমা, বিকেলে দেখে এসেছি টেমস নদীর পাড়ের ঘরবাড়িগুলোর ওপর শেষ বিকেলের আলো। মনে হয়েছিল কখনো কখনো সূর্য বুঝি অতিরিক্ত কিছু উজাড় করে দেয়। তখন নিজের অনেক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমেছিল টেমসের ওপরে। সেই পটভূমিতে বিগবেন, লন্ডন, টাওয়ার, সেন্টপল চার্চ ছায়ানৃত্যের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। দেখেছিলাম প্রাচীন লন্ডনের ছবি। এক সময় ভবনগুলো কালো হতে থাকে। এমন অন্ধকার রাতই তো তুমি আর আমি দেখেছিলাম ফুলমসি গ্রামে। কী অপরূপ রাত ছিল! ভাবলে আমি রোমাঞ্চিত হই অনিমা। এখনো এই লন্ডন শহরে বসে সেইসব রাত আমার কাছে স্বপ্নের মতো লাগে।

জানো, কয়েক দিন আগে এক বাদ্যযন্ত্রের দোকানে গিয়েছিলাম। বেশ ভিড় ছিল। প্রায় গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে হাঁটা বলতে পারো। ওয়েস্ট এন্ডের পুরনো পাথর বাঁধানো রাস্তায় হাঁটতে বেশ লাগছিল। এমন ভিড় দেখলে আমার সদরঘাট আর ফার্মগেটের ভিড়ের কথা মনে হয়। এমন স্মৃতি লালন করতে করতে নজরে আসে দোকানটা। দোকানিকে দেখে মনে হচ্ছিল মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর হবে। না হলে চীনা তো হবেই। দোকানে টাঙানো উইন্ড চাইমটায় নাড়া দিয়ে টুংটাং শব্দ করি, শব্দ শুনে দোকানি স্ব তুলে তাকিয়ে চোখ নামায় পত্রিকায়। দোকানের বৈচিত্র্যপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র দেখে আমি বিস্ময়ে হাঁ করে। দাঁড়িয়েছিলাম। দোকানি জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কোনটা দেখাব? আমি নিজেই আগে একটু দেখেনি বলে দু-পা এগুলাম। কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে দেখলাম গাছের ডালের মতো লম্বা একটা জিনিস। বড় একটা। বাঁশের ঝুড়িতে রাখা। তিন ইঞ্চি ডায়ামিটারে প্রায় দেড় ফুট লম্বা কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র দেখে আমার মুগ্ধতা কাটে না। একটা হাতে নিয়ে দেখলাম খুব হালকা, দেশে শুকনো ঝিঙ্গের যে আদল পেতাম সে অনুভূতি মনে আসে অনিমা, শুধু এই বাদ্যযন্ত্রের আকারটা ভিন্ন। দোকানি আমার বিস্ময় খেয়াল করে কাউন্টার ছেড়ে এগিয়ে আসে। বাদ্যযন্ত্রটা কীভাবে বাজাতে হয় তা দেখায়। প্রথমে মাথাটা নিচে, পরে উপরের দিকে নিয়ে বাজিয়ে শোনায়। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, মনে হয়েছিল পানির স্রোতের মতো নেমে গেল একরাশি বাহারি পুঁতি, যেন আমার ক্যামেরায় তোলা সেই পাহাড়ি মেয়েটিকে আমি এই বাদ্যের সুরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এই মাত্র ছিড়ে গেছে তার রঙিন পুঁতির মালা, যা সে কোনো এক বিকেলে উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে গেঁথেছিল। তার পুঁতিগুলো ঝমঝম শব্দে নেমে গেল জলের স্রোতে। আমি নিজেও দোকানির মতো করে বাদ্যযন্ত্রটি বাজালাম। আবার

সেই মনোমুগ্ধকর ধ্বনি। আমি তোমার জন্য বাদ্যযন্ত্রটি কিনেছি অনিমা। আমরা দুজনে চাদনি রাতে যন্ত্রটি বাজাব।

এই বাজনার মগ্নতার রেশ যেন কেটে না যায় সেজন্য আমি দ্রুত বেরিয়ে আসি। মানুষের ভিড়ে যতই হাঁটি হাতের ওঠানামায় সুর ওঠে। আশপাশের লোকেরা খুশি হয়ে মাথা নাড়ে। কেউ কেউ বাদ্যযন্ত্রটি হাতে নিয়ে নেড়েচড়ে দেখে। আর আমার মুগ্ধতা তো কাটেই না।

এ শহরের ফুটপাথ ধরে হাটতে ভালো লাগে অনিমা। তোমাকে নিয়ে এই শহরে হানিমুন করতে আসব। তোমার শুনে ভালো লাগবে যে আমার স্কুলে যাওয়ার পথে একটি পার্ক পড়ে, সেই পার্কের মাঝখানে মহাত্মা গান্ধীর কষ্টিপাথরের মূর্তি আছে–পদ্মাসনের মতো হাঁটু ভাঁজ করা, পিঠে চাদর ফেলা। একদিন মাধবীকে মূর্তিটি দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম। গান্ধীজির শুকনো শরীর–ঝরা পাতার সময়ে, বাতাসে, রোদে, বৃষ্টিতে আর কখনো হালকা তুষারপাতের মধ্যে নির্বিকার বসে থাকেন, যেমনি করে নিজের আদর্শে স্থির ছিলেন শেষ পর্যন্ত। এখানে নানা রঙের গোলাপ ফোটে। ভীষণ ভালো লাগে–কত গাছ, কত বৈচিত্র্য–মন ভরে যায়। লন্ডনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সবুজের মিশেল আমাকে এই শহরের প্রেমে পড়িয়েছে। গান্ধীর মূর্তির অনেক ছবি তুলেছি, আর ঘরে ফিরতে ফিরতে ভেবেছি এদের উন্নয়নের সঙ্গে গাছ কাটার সম্পর্ক নেই–খাল কাটার সঙ্গে সঙ্গে গাছ কেটে ফেলার রাজনীতি ওরা করে না কিংবা গাছ কেটে বিক্রি করে কালো টাকা বানায় না। নিজের দেশের জন্য খুব মায়া হয় অনিমা, এত ব্যর্থতা কেন আমাদের! আজ এ পর্যন্ত। তোমার হলুদ গোলাপ তন্ময়।

দুদিন পরে মাধবীকে গান্ধীজির মূর্তিটি দেখাতে নিয়ে যায় তন্ময়। ওই পার্কে বিশাল বিশাল কিছু গাছ আছে, যার ছায়ায় কাঠের বেঞ্চও পাতা আছে। ইচ্ছে করলে সময় কাটানো যায়, চিৎ হয়ে শুয়ে গাছের ডালপালা দেখা যায়। পার্কে একটি ছোট খাবার দোকান আছে। সেখানেও আড্ডা মারা যায়, ফুলের রঙ আর বিন্যাসের কারুকাজ তো সীমাহীন, কোনটা ফেলে কোনটার দিকে তাকাবে! মাধবী চারদিকে তাকিয়ে বলে, চমৎকার জায়গায় এনেছ। আমি পার্কটা খেয়ালই করিনি। এখানকার এত কিছুর পরেও আমার একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে।

কোনটা! আমি এত এসেও আলাদা করে কিছু দেখতে পাইনি।

তাহলে বোঝ, আমার চোখ তিনটা।

সেটা আমি তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারি। তুমি যদি বলো যে তোমার চোখ দশটা তাও আমি মেনে নেব। এখন বলো আলাদা কী বৈশিষ্ট্য তুমি পেলে?

তাকিয়ে দেখো ছোট ছোট নানা রঙের ঘাসফুল, আর লতাগুল্ম পার্কটাকে কেমন উজ্জ্বল করে রেখেছে।

ঠিক বলেছ। আমিও দেখেছি, কিন্তু এভাবে ভাবিনি। কী খাবে বলো, আজ আমি তোমাকে খাওয়াব।

এক শর্তে খেতে রাজি আছি।

বলে ফেল।

আমার যতক্ষণ ইচ্ছে হবে ততক্ষণ এখানে বসে থাকতে হবে।

রাজি।

দুজনে রেস্তোরাঁয় ঢোকে। স্যান্ডউইচ আর কফি নেয়।

তন্ময় বিস্ময়ে বলে, শুধু এই?

আপাতত এই, ইচ্ছে হলে পরে নেব।

স্যান্ডউইচ শেষ করার আগেই একজন আফ্রিকান মহিলা এসে ওদের টেবিলে বসার পারমিশন চায়। দুজনে সায় দেয়। মহিলার নাম জুলিয়ানা। বেশ হাসি-খুশি। হো-হো

করে হাসতে পারে যখন-তখন। তিনজনের আড্ডা ভালোই জমে ওঠে তবে আলোচনা শেষ পর্যন্ত মাধবী ও জুলিয়ানার জীবন ধারণায় গিয়ে গড়ায়। মাধবী এক পর্যায়ে বলে, আমার মা চেয়েছিল আমার বিয়েটা যেন টিকে যায়। কিন্তু আমি মাকে বোঝাতে পারিনি যে বিয়ে টিকে গেলে আমার সুখী হওয়ার আশাটি হবে শূন্য। কারণ সারাক্ষণ মাথা নত করার শেখার ভেতরে ঢুকে থাকার ব্যবস্থাটি একদমই সুখের নয়। ম্যারেজ ওয়ার্ক করলে কি ভালোবাসা ওয়ার্ক করে?

জুলিয়ানা তীব্র ভাষায় বলে, একদমই না।

জানো আমার স্বল্প দিনের বিবাহিত জীবনে আমি দেখেছি ভালোবাসা ও বিবাহিত জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।

জুলিয়ানা হাসতে হাসতে বলে, হোয়েন দ্য মিউজিক ইজ ওভার টার্ন অব দ্য লাইট। ওয়ান নিডস টু নো হোয়েন টু টার্ন ইট অফ।

ইয়েস, ঠিক বলেছ। মাধবী জুলিয়ানাকে সায় দিয়ে বলে, তোমার আর আমার অভিজ্ঞতা একই রকম। এশিয়া বা আফ্রিকা, মহাদেশ ভিন্ন হলেও কিছু যায়-আসে না– নারীর জন্য অবস্থা একই রকম। তন্ময় কিছু বলছ না যে?

তন্ময় হেসে বলে, আমি তোমাদের সঙ্গে একমত। এখন বিষয়টি আমি গভীরভাবে বুঝতে পারছি। আমার অভিজ্ঞতাও এমন যে দেখেছি নারীকে প্রেমের সময় যত তোয়াজ করা হয়, বিয়ের পরে তা পাল্টে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। বিয়ের পরে সে হয়ে যায় সাবঅর্ডিনেট। তোমরা যা বলছ তা শুনে বুঝতে পারছি, সত্যি বলার সময় এসেছে।

ব্রেভা তন্ময়।

তারপর গালগল্পের প্রসঙ্গ পাল্টে যায়–কত বিচিত্র বিষয়–এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপ-আমেরিকাসহ প্রতিটি মহাদেশ ছুঁয়ে যায়। সঙ্গে কফি, আইসক্রিম এবং স্যান্ডউইচ ও

পুডিং। কেমন করে যে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় ওরা হিসাব রাখে না। অনেক রাতে ঘরে ফেরে তন্ময়।

দেশে ফেরার সময় হয়েছে তন্ময়ের। ওর গোছগাছ শেষ। আগের রাতে মাধবী ওকে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে যায়। বিদায় নেবার আগে মাধবী বলে, তন্ময় দেশে গিয়ে যদি তুমি দেখো যে অনিমা তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে কিংবা ওর বাবা ওকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, তাহলে তুমি কিন্তু লন্ডনে ফিরে আসবে–তুমি যদি চাও আমি বাংলাদেশেও যেতে পারি, তোমাদের নদীভরা দেশটা আমার খুবই পছন্দ–আমি আমার বাকি জীবনটা ওখানে কাটিয়ে দিতে রাজি আছি। আমি তোমার। জন্য অপেক্ষায় থাকব তন্ময়।

তন্ময় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বলে, অপেক্ষা!

হ্যাঁ, অপেক্ষা। তোমার জন্য আমার অপেক্ষা।

মাধবীর চোখে জল টলটল করে। তন্ময় হাত বাড়িয়ে সে জল মুছিয়ে দেয়।

ঢাকায় নেমে বুক ভরে শ্বাস নেয় তন্ময়

ঢাকায় নেমে বুক ভরে শ্বাস নেয় তন্ময়। ইমিগ্রেশন পার হলে দূর থেকে দেখতে পায় মার্কে। সঙ্গে সখিনা আছে। আহ, অনিমা এখানে থাকলে ছবিটা পূর্ণ হয়ে যেত। আকস্মিকভাবে ওর মন খারাপ হয়। বেরিয়ে এলে সাবিহা বানু ওকে জড়িয়ে ধরে।

মাগো, আজ রাতে তোমার সঙ্গে আমি ঘুমুব। তোমার গন্ধ না নিয়ে আমি ঘুমুতে পারব না।

সত্যি?

একদম সত্যি।

মাকে না বলে পালাবি না তো?

তন্ময় মৃদু হাসে। সাবিহা বানু বলে, পালাতে হবে না। সব ব্যবস্থা ঠিক। টুকটাক কিছু কাজ বাকি আছে।

দিল্লিতে ওয়ার্কশপ?

মাত্র পনেরো দিনের। আমি চাই তুই ঘুরে আয়।

যদি না যাই? অনিমার সঙ্গে দেখা করব না?

মাত্র পনেরো দিন।

ঠিক আছে মা, ঠিক আছে। এই তুই কেমন আছিস সখিনা?

ও ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে বলে, আপনি আমারে এতক্ষণে দেখলেন? আমি কতক্ষণ আপনের দিকে চেয়ে আছি।

আমি তো তোর মাথায় হাত রেখেছি। মায়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম, বোকা মেয়ে। তোর জন্য একটা সুন্দর পুতুল এনেছি। দেখলে তোর কান্না থেমে যাবে। পাগল মেয়ে, আয়।

পাঁচ দিনের মাথায় ওকে আবার ঢাকা ছাড়তে হলো। আধঘন্টার মধ্যে এসে পৌঁছাল কলকাতায়।

ট্রলিতে স্যুটকেস ঠেলে বিমানবন্দরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই গরম বাতাসের হলকা এসে লাগে চোখে-মুখে–আশপাশে মানুষের ঠেলাঠেলি কিন্তু কোথাও তন্ময়ের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে কাউকে দেখতে পায় না। দময়ন্তীর আসার কথা আছে–আসেনি–হয়তো দেরি হবে আসতে–বেশ কিছুক্ষণ, ট্রলিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে–তারপর ভাবে, একটা ফোন করে দেখা যাক ওর কী হলো–ট্রলি ঠেলে ফোনের কাউন্টারে এগিয়ে যায়, লাইনে দাঁড়াতে হয়–গালের মধ্যে পান ঢুকিয়ে ফোনে চিৎকার করে কথা বলছে লোকেরা–নিজেকে শান্ত করে তন্ময় হায় বাঙালি বলে।

এক সময় লাইন পায়–ফোনের ওপাশ থেকে দময়ন্তী বলে, তোমার তো কাল আসার কথা–ই-মেইলে তুমি একুশ তারিখ লিখেছ–ঠিক আছে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। ওকে আর কিছু বলার সুযোগ নেই তন্ময়ের–নিজেই বিস্ময়ে থ–কুড়ির জায়গায় একুশ লিখেছি আমি–নিশ্চয় আমার মগজ ঘোল হয়ে গেছে–নিজের বোকামিতে নিজেকে শাপান্ত করে।

বিমানবন্দরের বাইরে লোকজন তেমন নেই–যারা আছে তারা। গালগল্প করছে–যাত্রীরা যে যার গন্তব্যে উধাও। কতবার এসেছে কলকাতায়–একটা ট্যাক্সি নিয়ে দময়ন্তীর সল্ট লেকের বাড়িতে চলে যেতে পারে–কিন্তু ওকে এ কথা বলারই সুযোগ পায়নি–দুজনেই ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে যায়–ওকে আর এ কথা বলার সুযোগ নেই–নিশ্চয় এতক্ষণে ও বেরিয়ে পড়েছে। এদিক-ওদিক। তাকিয়ে দেখে বসার জায়গা নেই, ট্রলিটা ভরসা–ওটাতে ঠেস দেয়া যায়। একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার এগিয়ে আসে, কোথায় যাবেন দাদা? আমার ট্যাক্সি আছে–বলুন কোথায় যাবেন?

জানি না কোথায় যাব।

জানেন না?

বললাম তো না।

আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?

হ্যাঁ।

তাহলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলুন পৌঁছে দি। কেউ নিতে আসবে আপনাকে?

হ্যাঁ।

ও তাই বলুন। আগে বলবেন তো। আমি শুধু শুধু গ্যাজাচ্ছি।

শুধু শুধু গ্যাজাওনি।

গ্যাজাইনি? ওর দুই ভ্রু কপালে ওঠে।

না, গ্যাজাওনি। তোমার কথা শুনতে আমার ভালো লাগছিল।

তাই বলুন। আমার বাপ-ঠাকুরদার ভিটা কিন্তু বাংলাদেশের ফরিদপুরে।

এই তোমাদের এক দোষ। বাংলাদেশের কাউকে দেখলে ওই দেশটায় একটা ভিটে আবিষ্কার করে ফেল।

না দাদা, মিথ্যা বলিনি। সত্যি আমার ঠাকুরদাদার ভিটা ছিল। স্বাধীনতার পরে আমি দেখতে গিয়েছিলাম।

ভিটে তো আর তোমাদের নেই।

তা কি আর থাকে! কত বছর পার হয়ে গেল–আমার জন্মের আগে। যাই বলুন দেশটা খুব সুন্দর।

সুন্দর? তুমি সুন্দর দেখেছ?

হ্যাঁ, তাই দেখেছি। খুব সুন্দর।

সুন্দর না ছাই, একটা ডাস্টবিন।

আপনি না কেমন যেন, যাই।

ও হতাশ হয়ে চলে যায়, বিপ্ন দেখায় ওকে এবং আশাভঙ্গের ম্রিয়মাণ ভঙ্গি ওর পায়ের নিচে জমে যায়–তন্ময়ের মনে হয় ওর পা টানতে কষ্ট হচ্ছে–তাকিয়ে থাকে ও–ওকে দেখে–একজন পোড়খাওয়া জীবনসংগ্রামের রাস্তায় তাড়িত যুবক–কালো রঙের ট্যাক্সির দরজা খুলে বাইরে পা রেখে বসে থাকে। একটু পরে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে একটি চিকন কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচায়। তন্ময়ের ভীষণ হাসি পায়–মানুষের বিচিত্র অভ্যেসের সঙ্গে পরিচিত নয় বলে নানা বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে যায়। ছবি তুলবে কি না ভাবে–অল্পক্ষণে একটি মেয়ে কাছে এসে হাত বাড়ায়–ও তখনো ডলার ভাঙায়নি তাই ভারতীয় টাকা ওর কাছে নেই–সে কথা বলতে মেয়েটি ওকে ভেংচি কাটে–শরীরের আকার দেখে মনে হয় তরুণী মেয়ে–উনিশ-কুড়ি বছর হতে পারে–আশ্চর্য, ও রেগে ওঠে না–জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবে?

তাতে তোমার দরকার কী?

ও অন্য পাশে চলে যায়–ভীষণ নোংরা একটা শাড়ি পরে আছে–ব্লাউজটা ছেড়া–পেটিকোটও পায়ের দিকে হেঁড়া–কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ–ব্যাগের পেট ফোলা, কী ঢুকিয়েছে কে জানে–ওর ডান হাত ব্যাগের ভেতরে–আধা খাওয়া একটা পাউরুটি বের করে সেটা চিবুতে থাকে–ওকে তন্ময়ের পাগল মনে হয়নি–পাশ থেকে দশ-বারো বছরের একটি বালক ওকে খ্যাপায়–ওই পাগলি দুধ খাবি?

ও ছেলেটির দিকে তাকায় না। ট্যাক্সিঅলার কাছে গেলে ড্রাইভার পেছনের দরজা খুলে দিলে ও ভেতরে ঢুকে বসে–দরজা খোলা থাকে–হুহু বাতাস ঢোকে সেই পথে–লোকটি মেয়েটির সঙ্গে গল্পে মাতে। তন্ময় ওদের হাত নেড়ে কথা বলার ভঙ্গি দেখে। বছর পাঁচেক আগে দেবাশিষের আমন্ত্রণে কলকাতায় এসেছিল–দমদমের কাছে তাপস আর

কল্পনার বাসায় ছিল ব্যবস্থাটা দেবাশিষ করেছিল–খুব ভোরে ফ্লাইট ধরতে হবে বলে বিমানবন্দরের কাছাকাছি থাকা। রাতে কল্পনা বলল, তন্ময় ভোরে আমার বাসায় কাজ করতে যে মেয়েটি আসে ও বাংলাদেশের। খুলনায় বাড়ি, ভোরে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

মনে করে দিও কিন্তু, আবার যেন কাজ করে চলে না যায়।

কবে থেকে কাজ করছে?

তিন-চার মাস হবে। বাড়িতে স্বামী আছে, দুই ছেলেমেয়ে আছে। ওদেরকে শাশুড়ির কাছে রেখে কাজ করতে আসে। কিছু উপার্জন করে ফিরে যায়।

কীভাবে আসে? পাসপোর্ট আছে?

ওসবের বালাই নেই। সীমান্তরক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আসে। নয়তো কিছু টাকা-পয়সা দেয় হয়তো।

অভাবী মানুষের দেশ নেই কল্পনা। নিজেদের শ্রমটুকু যাদের মূলধন তাদের সামনে দেশের সীমানাও মুছে যায়। ওরা খোঁজে শ্রম বিক্রির বাজার।

তাপস আর কল্পনা মাথা নাড়ে। কল্পনা বাড়তি যোগ করে বলে, ওরা শ্রম দেয় বলে আমরাও নিজেদের কাজে যেতে খানিকটুকু শান্তি পাই। নইলে ঘরের এত কাজ করে অফিসে যেতে টায়ার্ড হয়ে পড়ি।

অনেক রাত জেগে কল্পনা আর তাপসের কণ্ঠে গান শুনে–আচ্ছা দেয়–মাত্র গতকাল ওরা শান্তিনিকেতন থেকে ফিরেছে–সেই প্রসঙ্গে কথা হয়–ভবিষ্যতে ওরা কী ধরনের অনুষ্ঠান করবে তার কথা বলে। তন্ময় বারবার বলে, আমি কিন্তু ওই মহিলার ছবি তুলব। মনে রেখো।

ভোরে ঘুম ভাঙে একটু দেরিতে–তাড়াহুড়ো করে তৈরি হতে থাকে ও। কল্পনার কাজের লোক বাসনকোসন ধুচ্ছে টের পায়–ভাবে, ও নিশ্চয় ওর জন্য অপেক্ষা করবে–একটু পরে কল্পনা এসে বলে, মেয়েটা তোমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলো না।

খানিকটা আহত হয় ও–অপমানিতও–কী হয়েছে ওর–ওর অপরাধটা কোথায়–কল্পনা ওর মনোভাব বুঝতে পেরে বলে, ও তোমাকে ভয় পাচ্ছে।

কেন?

ওর তো পাসপোর্ট নেই–লুকিয়ে এখানে কাজ করতে এসেছে–তুমি যদি পুলিশকে বলে দাও। তোমাকে বিশ্বাস কি?

তাই তো, আমাকে বিশ্বাস কি–আমি তো ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি কে জানে ও এমন অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছে–মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সহযোগিতা না করে বিরুদ্ধাচারণ তো বেশিরভাগ মানুষের স্বভাব–আমি কি এর বাইরে? ও পৃথিবীর দরিদ্রতম ক্ষুদ্র একটি দেশের জনসংখ্যা অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর একজন–এই আঁস্তাকুড়ের মতো ক্ষুদ্র একটি জায়গায় ও তো পায়ের নিচে পিষ্ট মানুষের দলে–ওর কাছে বেঁচে থাকা সত্য–বেঁচে থাকার জন্য ও কাজ খোঁজে–কাজ থেকে টাকা চায়–তা দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করতে চায়–কে জানে ওর পরিবার কেমন, ওর বাচ্চারা পরিত্যক্ত শিশু কি না, স্বামী কাজ খুঁজতে গিয়ে ঢাকা শহরে হারিয়ে গেছে কি না–আমি কে যে ও আমাকে সময় দেবে–ওর সময়ের মূল্য আছে–ভোরবেলাতেই ওকে চার-পাঁচটা বাড়িতে কাজ সারতে হয়। ভিন দেশে কাজ করতে এসে সময় নষ্ট করবে কেন ও–আর অবিশ্বাস? অবিশ্বাস তো করবেই–বিশ্বাসের কোনো ক্ষেত্র তো কেউ ওদের জন্য তৈরি করে না–ওরা নিজের গায়ের জোরটুকু সম্বল করে ফাঁকফোকর খুঁজে বেঁচে থাকার রাস্তা বের করে–সেখানে ওর মতো ক্ষুদ্র মানুষের সঙ্গে দেখা করা সময়ের অপচয়–অর্থহীন নিরন্ন হাহাকারের পালে বাতাস লাগা–হায় পৃথিবী, আমাদেরকে আস্তাবলের বাইরে নিয়ে যাও–বুক ভরে বাতাস টানতে দাও।

পেছন থেকে দময়ন্তী এসে ঘাড়ে হাত রাখে।

তুমি নিশ্চয় আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছ?

তন্ময় ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তাই তো মনে হয় দময়ন্তী।

তারিখ ভুল লেখার খেসারত দিলে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে। নিশ্চয় খুব খারাপ লেগেছে?

একটুও না। দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ দেখেছি–এই দমদমের কোনো এক বাসার কাজের ঝিকে নিয়ে ভেবেছি। ছবি তোলার কথা ভেবেছি, কিন্তু তোলা হয়নি।

ভারি অদ্ভুত তো! তোমার সময় তাহলে ভালো কেটেছে বলতে পারো।

দারুণ কেটেছে। সময়কে আমি অর্থহীন হতে দেই না।

এই সময়টুকু তোমার কী কাজে লাগবে?

নিঃসন্দেহে কোনো কিছু পরিকল্পনা করার কাজে লাগবে।

দময়ন্তী হো-হো করে হেসে বলে, চলো। তারিখ ভুল করার আরো একটি খেসারত তোমার জন্য আছে।

তুমি আমাকে ঘাবড়ে দিতে পারবে না। বিদেশে যত অ্যাডভেঞ্চার তত মজা। বলো খেসারতটা কী?

এই দুপুরবেলা তোমাকে আমি বাসায় নিয়ে খাওয়াতে পারব না। রেস্টুরেন্টে খেতে হবে।

তথাস্তু। তোমার বাড়ির খাওয়া আমার জন্য তোলা রইল।

শোনো, তুমি তো সন্ধ্যার ফ্লাইটে দিল্লি যাবে। দিল্লি থেকে ফেরার পথে আমার এখানে দুদিন থেকে যেও।

উঁহু, তা হবে না। সময় নেই, আমার দেশে কাজ। অনিমা অপেক্ষা করে আছে।

দময়ন্তী আর তন্ময় ট্রলি ঠেলে ওর গাড়ির কাছে যায়। গাড়ি ও নিজে। চালায়–ড্রাইভার নেই–দুজনে টেনেটুনে স্যুটকেস গাড়িতে তোলে–দময়ন্তী সাদার ওপর কাজ করা চমৎকার একটা শাড়ি পরেছে–গলায় লম্বা মালা–বয়স তো পঞ্চাশের ওপরে–কিন্তু দেখে মনে হয় কম–লম্বায় বেশি না–খানিকটা মটুসটু–ফ্যাটজনিত ত্বকের কারণে মুখে লাবণ্য থির হয়ে আছে। ওর দুই ছেলে আমেরিকায়–কলকাতার ফ্ল্যাটে একা থাকে–বন্ধুবান্ধব অনেক–পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা বেশি–বিদেশি স্বামী অনেককাল আগে ওকে ছেড়ে চলে গেছে–সেটা নিয়ে ওর মাতম নেই–বরং বেপরোয়া উন্মাদনায় জীবন উপভোগের তৃষ্ণায় ছটফটানি আছে–সমাজসেবা করে ও তো ভালো আছে–ভালোই থাকবে।

ওরা যে রেস্তোরাঁয় ঢোকে তার নাম নীলাঞ্জনা'।

তন্ময় বলে, নাম দেখেই বুঝতে পারছি প্যানপেনি বাঙালিয়ানার মধ্যে ঢোকালে আমাকে।

ও হালকা কর্তৃত্বের সুরে বলে, বসে পড়ো। আশপাশে আর ভালো রেস্টুরেন্ট নেই। আমারও ক্ষিদে পেয়েছে।

দময়ন্তী দুই চেয়ারঅলা একটি ছোট টেবিল দখল করে। খদ্দের কম নেই–ধুম খাচ্ছে সব–ভর্তা, ভাজি, ডাল, মাছ এসব পরিবেশ দেখে তন্ময়ের খাওয়া মাথায় ওঠে–দেশের বাইরে ও নিজের দেশের খাবার খেতে চায় না। কী আর করা, চেয়ার টেনে বসে। হঠাৎ করেই ওর লন্ডনের নান্দোস রেস্টুরেন্টের কথা মনে হয়–প্রচুর ঝাল দিয়ে চিকেনের ডিশটা ওর জিভে জল আনে। স্বাদ এমনই যে জিহ্বা পুড়ে গেলেও সেদিকে খেয়ালই থাকে না।

কী খাবে বলো? এই যে মেনু।

তুমি যা খুশি তা অর্ডার দাও। আমার কোনো বাছাবাছি নাই। কারণ খাবারটা আমি খাচ্ছি তোমার পাল্লায় পড়ে–অনুরোধে পেঁকি গেলা আর কি!

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলে, তাহলে কলকাতার একটা জিনিস তোমাকে খাওয়াতে পারি, সেটা তুমি পৃথিবীর যত দেশে গেছ সেসব দেশের

কোথাও খাওনি।

স্বাদ কেমন?

খেয়ে বুঝে দেখো। তাহলে অন্যখানে যেতে হবে।

না বাপু, আমি আর লড়ালড়ি করতে পারব না। জিনিসটা কী বলে? দময়ন্তী তন্ময়ের চোখে চোখ রেখে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, বিষ।

তন্ময় শব্দ করে হেসে ওঠে। আশাপাশের টেবিলের লোকজন ওদের দিকে তাকায়। তন্ময় ভ্রুক্ষেপ করে না। জোরে জোরেই বলে, মাত্র গতকাল ঘটেছে এমন একটি ঘটনার কথা কি আমি তোমাকে বলব?

দময়ন্তীর কন্ঠস্বর এবার একটু নরম হয়। আস্তে করে বলে, বলো।

গত কয়েক দিন বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের ফলে ভেসে গেছে বাংলাদেশের অসংখ্য এলাকা–গরিব মানুষের দুর্দশা সীমাহীন–ঘর ডুবে গেছে–ঘুমুনোর জায়গা নেই–কাজ নেই তো চাল কেনার পয়সা নেই–রিলিফের কত তোড়জোড় টেলিভিশনের পর্দায়–গুটিকতক মানুষের কাছে পৌঁছে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য–বাকিরা ঠুটো জগন্নাথ–এক ঘঁটে কুড়ানি মা তিনদিন ধরে ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু জোগাড় করতে পারেনি–চৌদ্দ বছরের কিশোরী মেয়েটি মায়ের কাছে ভাত চায়–মা ভাত কোথায় পাবে–ভাত

জোগাড় করতে না পারার বেদনার সঙ্গে ওর ক্রোধও আছে বুকের ভেতরে–অক্ষমতার যন্ত্রণা বড় নির্মম–মেয়ে আবার ভাত চাইলে মা বলল, ভাত নাই, বিষ খা।

এই পর্যন্ত বলে তন্ময় চুপ করে যায়। গ্লাসে পানি রেখে গেছে বেয়ারা। ঢকঢকিয়ে এক গ্লাস পানি খায়। টিস্যু দিয়ে মুখ মোছে। দময়ন্তীকে বলে, খাবারের অর্ডার দাও। ও উত্তর দেয় না। আশপাশের টেবিলের লোকেরা ওর দিকে তাকিয়েই আছে। কেউ ভাত খাওয়ায় মনোযোগী নয়। ও বুঝতে পারে যে ওরা পরেরটুকু শুনতে চায়। তখন কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রেস্তোরাঁর কিশোর বয়টি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি কী করল?

রাতে কীটনাশক পান করল। আশপাশের লোকজন হুড়োহুড়ি করে। হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার জানা মরে গেছে।

ছেলেটি দু-হাতে চোখের জল মুছে বলল, আমার বাড়ি সাতক্ষীরায়। আমার নাম গোপাল।

ও তুইও সেই ডাস্টবিন থেকে উঠে এসেছিস গোপাল?

ডাস্টবিন!

চারপাশে গুঞ্জন ওঠে–মানুষেরা পরস্পরের দিকে তাকায়–কেউ ভাত খাওয়ায় মনোযোগী হয়–যাদের খাওয়া শেষ হয়েছে তারা উঠে পড়ে–কেউ বিল দেয়ার জন্য কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে–দময়ন্তী কড়া স্বরে বলে, তুমি এত অসহিষ্ণু কেন? তোমার চিঠি পড়ে এমন মনে হয়নি–চিঠি পড়ে মনে হতো তুমি শান্ত, ধীরস্থির, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নাও।

তন্ময় দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে–রাস্তায় গাড়ি-ট্রাক লোক চলাচল দেখে–মানুষের মুখচ্ছবিতে স্বদেশের চিত্র ফোটে না–মানুষ বিষণ্ন এবং ক্লান্ত–গুটি কয়েক ক্ষমতাবান মানুষের হাতে কোটি কোটি মানুষ জিম্মি–মানুষের জীবনের জন্য তাদের কোনো তোয়াক্কা নেই–নিজেদের পকেট বোঝাই হলেই হলো–সেটা ডোনারের টাকাই

হোক বা বিদেশ থেকে আসা রিলিফের সামগ্রীই হোক–ওদের ধর্ম লুট করা, ওদের প্রার্থনা বেশি বেশি টাকা কিংবা খাদ্যসামগ্রী আসা, ওদের বিনোদন অস্ত্র এবং মানুষ মারার মহোৎসবে অংশগ্রহণ–আমি অসহিষ্ণু হবো না তো কে হবে–অসহিষ্ণু হওয়ার এত কিছুর মধ্যে বাস করে কেইবা সহিষ্ণু থাকতে পারে–আমি তো নই-ই–কারণ এই জুনে আমি সাতাশ বছর বয়সে দাঁড়িয়েছি। দময়ন্তীর সঙ্গে ইন্টারনেটে পরিচয়–তারপর চিঠি লেখালেখি, পরিচয় অনেক দিনের হলেও ওর সঙ্গে দময়ন্তীর দেখা তো এই প্রথম, ওকে নিয়ে ও যেন আর ব্রিত না হয়। দেখতে পায় দময়ন্তী খাবারের অর্ডার দিয়েছে গোপালকে–গোপাল খাবার আনতে যায়। দময়ন্তী ওর দিকে তাকায়।

অভিমানী মেয়েটি এভাবে জীবনের মূল্য দিল?

অভিমানী নয় সাহসী–সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করেছে মেয়েটি।

খুব কষ্টের মৃত্যু–দময়ন্তীর কণ্ঠে আফসোস।

মরেছে ভালো হয়েছে–পোকার মতো বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো–বাবা-মা তো যৌন সুখ মেটাতে গিয়ে সন্তান উৎপাদন করে, সে জন্য বেঁচে থাকার দায় না রাখলেইবা কী!

তন্ময়ের কথায় ব্রিত হয় দময়ন্তী। তি কণ্ঠে বলে, আজ আমি তোমাকে একটুও বুঝতে পারছি না–চিঠিতে তুমি জীবনের পক্ষে কথা। লিখতে প্রবলভাবে, আশাবাদী মানুষ হিসেবেই তোমাকে আমি চিনেছিলাম। আজ তুমি এমন ক্রুদ্ধ কেন?

ভাত খাও। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। কতটা রাস্তা গাড়ি চালালে!

গাড়ি চালালেই ক্ষিদে পায় না।

পায়। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

মুখ শুকিয়েছে তোমার কথা শুনে।

দময়ন্তী গম্ভীর হয়ে বলে–ও তন্ময়ের দিকে তাকায় না–তন্ময় বেশ মজা পায়–বিষয়টি উপভোগ করে–মনে হয় আজ যেন ওর উড়াল দেবার দিন–বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ও এক ভীষণ মুক্ত মানুষ–এখানে ওর চারপাশে কেউ নেই যার জন্য ওর দায় আছে–যার কথা ভেবে কষ্ট পাবে–কিংবা তার জন্য খানিকটুকু করার জন্য এক পা এগোবে।

গোপাল ভাত-তরকারি এনে টেবিলে রাখে। দারুণ অর্ডার দিয়েছে দময়ন্তী–কই মাছ, পাবদা মাছ, মুড়িঘন্ট, পটোল ভাজি, বেগুন ভাজি, টক দই–তন্ময় চোখ বড় করে বলে, করেছ কি?

খাও, খেয়ে মাথা ঠান্ডা করো।

আমার মাথা একদম ঠান্ডা–এন্টার্কটিকা মহাদেশের মতো বরফে ঠাসা।

কথা শুনে মনে হয় না। রেগে আছ? তা বলতে পারো। ও বাব্বা, এটা আবার মুখে স্বীকার করছ!

দময়ন্তী কথা না বলে ভাত খায়–প্লেটের দিকে ওর গভীর মনোযোগ–সন্তর্পণে কই মাছের কাঁটা বাছছে।

তুমি কই মাছ পছন্দ করো দময়ন্তী?

ভীষণ। তুমি?

পছন্দ করি, তবে কাঁটাটা বিরক্তিকর। কেউ কাঁটা বেছে দিলে খুশি হই।

বেছে দেব?

উঁহু, এটা বাড়ি না। রেস্তোরাঁয় বসে এসব চলে না। নিজেই বেছে খাব। অসুবিধা হবে না। মাছের সাইজটা বেশ বড়, ভালো লাগছে। খেতে।

এমন সময় গোপাল ছোট একটি বাটিতে একটুখানি আচার নিয়ে এসে তন্ময়ের সামনে রেখে বলে, এটা আপনার জন্য।

কেন, আমার জন্য কেন?

আপনি যে আমার দেশের লোক। আপনাকে আমি আর কী দেব! পারলে তো নেমন্তন্ন করতাম, কিন্তু আমার তো বাড়ি নাই। এই আচারটুকু লুকিয়ে আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। খান। খেলে আমি খুব খুশি হবো।

আমার বান্ধবীকে না দিয়ে কি খাওয়া যায়? ওকে দিই?

দিন। দুজনে খান।

গোপাল ওদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তন্ময় জিজ্ঞেস করে, কত দিন হয় দেশ থেকে এসেছিস গোপাল?

তিন বছর।

একা এসেছিস?

না, দুই বোনের সঙ্গে।

বাবা-মা কোথায়?

দেশেই আছে। ভিটে-জমি আছে যে। ছেড়ে আসবে কেন?

তোরা এলি কেন?

গোপাল মুখ নিচু করে চুপ করে থাকে।

তন্ময় নরম স্বরে বলে, তোদের কী হয়েছিল গোপাল?

আমার দুবোনকে সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে গিয়ে...

হয়েছে, আর বলতে হবে না। বুঝেছি। ছাড়া পাওয়ার পর বাবা-মা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, না?

হ্যাঁ, গোপাল কাঁদকাঁদ কণ্ঠে বলে।

তোদের তাও পালিয়ে আসার জায়গা আছে। আমার নেই। আমি মানে আমার মতো কোটি মানুষ।

তন্ময় গোপালের দেয়া আচার তর্জনি দিয়ে চেটে খায়। মিষ্টি আমের। আচার– চমৎকার বানিয়েছে। জিজ্ঞেস করে, এই তিন বছরে দেশে যাসনি?

না। বোনরা যেতে দেয় না। ওদের ধারণা, আমি গেলে সন্ত্রাসীরা আমাকে মেরে ফেলবে।

যাসনি ভালো করেছিস। ডাস্টবিন থেকে বেরিয়েছিস ঠিক করেছিস।

গোপাল চোখ মুছে বলে, আমার দেশে ফিরতে খুব ইচ্ছে হয়। এখানে আমার পরান টিকে না। আমাদের গ্রামটা খুব সুন্দর। এসএসসি পাস করে যে পড়তে পারলাম না এজন্য খুব কষ্ট হয়। স্কুলে আমি জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' খুব ভালো গাইতে পারতাম। সব অনুষ্ঠানে–

ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে গোপাল। কাউন্টারে বসে থাকা ম্যানেজার ছুটে আসে।

ছেলেটা যখন-তখন দেশের কথা মনে করবে আর কাঁদবে। ওকে আমি ফেলতেও পারছি না, গিলতেও পারছি না! আপনি বুঝি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? দেশের লোক দেখলে ওর দুঃখ আরো বেড়ে যায়।

তন্ময় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মুখ ভেংচিয়ে বলে, দুঃখ আরো বেড়ে যায়–ন্যাকামি–দুবোন ধর্ষিত হয়েছে, তাতেও হুঁশ হয় না।

হবে কেন? ও তো আপনের চেয়ে বেশি দেশপ্রেমিক। আয় গোপাল।

দুজনে হনহনিয়ে চলে যায়।

দময়ন্তী অসন্তুষ্ট চোখে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলে, হলো তো ভালো শিক্ষা পেয়েছ–ওরা কি তোমার তিক্ততা বুঝতে পারবে–আমার সঙ্গে রাগ ঝাড়ছ ঝড়ো–সবখানে ঝেড়ো না–সবার মাথা সূক্ষ্ম নয়।

দময়ন্তী, চলো অন্য কোথাও যাই। কোথায় যাবে?

রাত সাড়ে আটটায় আমার ফ্লাইট–এখনো অনেক সময় হাতে আছে।

চলো তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই–সেখানে গেলে এক জায়গায় অনেক কিছু দেখতে পারবে।

ওরা যখন রেস্তোরাঁ থেকে বের হয় তখন গোপাল এসে সামনে দাঁড়ায়–তন্ময় আগেই দময়ন্তীর কাছ থেকে কয়েকটা টাকা নিয়েছিল ওকে দেবে বলে–টাকাগুলো ওর পকেটে দিয়ে দেয়–ভালো থাকিস গোপাল–অনেক ভালো, খুব ভালো–

দেশ ছাড়া আমি ভালো থাকতে পারি না–বিদেশে বেশি দিন থাকলে আমার পরান পোড়ে–

আবার ওর চোখ জলে ভরে যায়–ওর জন্য তন্ময়ের ভীষণ মায়া হয়।

দময়ন্তী মৃদুস্বরে বলে, তোমাদের দুজনের দুরকম এক্সপ্রেশন–আমার বেশ অভিজ্ঞতা হলো–আমি ভুলব না–গোপাল তোমার মতো বোঝে না বলে রাগে না–কেঁদে ভাসায়–তুমি অনেক কিছু বোঝ বলে রাগ ঝাড়ো।

তোমার এমন পরিস্থিতি হলে তুমি কী করতে?

আমি দুটোই করতাম। কখনো রেগে যেতাম, কখনো কেঁদে ভাসাতাম।

তন্ময় হা-হা করে হেসে বলে, আমিও তাই করি–তোমাকে পেয়ে আমার মনে হয়েছে তুমি আমার রাগ ঝাড়ার জায়গা–চলো কোথায় যাবে বলছিলে।

দময়ন্তী গাড়ি ড্রাইভ করে–পথের দুপাশে বাড়িঘর, মানুষ ছুটে চলার প্রচণ্ড গতি–অকস্মাৎ ও সব কিছু থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে–ওর বমি পায়–কান্না পায়–ওর মাথায় বিতৃষ্ণার ঘূর্ণি জন্মায়–কলকাতা শহর দেখবে না বলে চোখ বোজে।

তোমার খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ। তন্ময় ক্লান্ত কণ্ঠে বলে।

রেস্ট করবে? ঘুমুতে চাও?

ধুত বাজে বকো না। কোথায় যাচ্ছিলে যাও।

তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা–অথচ তুমি এমন ঢঙে কথা বলছ যেন আমাদের হাজার বছরের পরিচয়।

তন্ময় শব্দ করে হাসতে থাকে–ওর কথার উত্তরে কিছু বলে না–ছোটখাটো মটুসটু দময়ন্তী একা থাকে–ওর বেশ কয়েকজন ছেলে বন্ধু আছে–ওদের সঙ্গে আড্ডা হয়–কারও সঙ্গে রাতও কাটায়–কিন্তু ওকে তন্ময়ের ভীষণ বোকা মনে হয়–খানিকটা গ্রাম্যও–যে সূক্ষ্মতা থাকলে কাউকে ও নিজের বিচারের মাত্রার উপরে ওঠাতে পারে দময়ন্তী তেমন নয়–মাত্রার নিচে আধুনিকতার ভান আছে–কিন্তু বোঝে না–তবে ওর সঙ্গে ঘুরে কখনো ওর সরল মাধুর্য ওকে আকৃষ্ট করে। ও অসম বয়সের বন্ধুত্ব উপভোগ করে। এত চিঠি লেখালেখি হয়েছে যে মনেই হয় না এই প্রথম দেখা! শুরু থেকেই চেনা মানুষের মতো আচরণ করছে।

ও তন্ময়কে একটি জায়গায় নিয়ে যায়–কী যেন একটা নাম বলে তা ওর মনে থাকে না–তবে এখানে বিচিত্র জিনিসের সমাহার আছে–পেইন্টিং গ্যালারি–আকারে ছোট–কিন্তু পুরনো পেইন্টিংগুলো অ্যান্টিকের মতো—-কোনোটা আকারে বেশ বড়, নতুন-পুরনো মিলিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবিগুলো অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখে ও–বাইরে চনমনে দুপুর–ভেতরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ–বসার জায়গা আছে–চেয়ারগুলোরও অ্যান্টিক চরিত্র–পরিচ্ছন্ন-রুচিশীল। ও দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলে, থ্যা দময়ন্তী।

হঠাৎ থ্যাঙ্কু? ও ভ্রু কুঁচকে তাকায়।

জায়গাটা দারুণ।

যাক তবু একটু প্রশংসা পেলাম। তোমার ই-মেইল পাওয়ার পর থেকেই ঠিক করেছিলাম তোমাকে এখানে নিয়ে আসব।

তুমি সরাসরি এখানে চলে এলেই পারতে। ভাত খাওয়ার দরকার ছিল না।

হো-হো করে হাসে দময়ন্তী–ওকে বেশ আত্মতৃপ্ত দেখায়–এটুকুই ওর গ্রাম্যতা, ওর গ্রাম্যতায় ও বিরক্ত হয়–ওর হাসির শব্দও শুনতে চায় না–বরং গণেশ পাইনের আঁকা বড় ছবিটার সামনে গভীর মনোযোগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে–দারুণ এঁকেছে–একসঙ্গে অনেক মানুষ–একটি গ্রামের হাট–কিন্তু প্রতিটি ফিগারের আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আর রঙের

সংবেদনশীল ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই–অনেকক্ষণ পর যখন গ্যালারি থেকে বের হয় তখন ভাবে কতবার কলকাতা এলো অথচ কারো কাছেই এই জায়গার কথা শোনেনি–দময়ন্তীর নির্বাচনে ওকে আধুনিক মানুষের খানিকটুকু প্রশংসা দেয়–কিন্তু মুখে আর কিছু বলে না–পাছে ওই উদ্ভট হাসি শুনতে হয়।

জায়গাটার কোনো এক দিক থেকে পপ সংগীতের সুর ভেসে আসছে–সঙ্গে ড্রামের শব্দ–ও নয়েজ পলিউশনে আক্রান্ত মানুষ–তারস্বরে ভেসে আসা কণ্ঠ এবং বাজনার শব্দ ওকে অস্থির করে তোলে–কিন্তু দময়ন্তীকে সে কথা বলার আগে ও তন্ময়কে নিয়ে ছোট একটি দোকানে ঢোকে–মুখোশ, টেরাকোটার খণ্ড, মাটি ও পেতলের মূর্তি, নানা ধরনের ধাতুর গয়না, ছোট আকারের পুরনো পেইন্টিং–কিছু বই ইত্যাদি দিয়ে সাজানো দোকান–বেশ চমৎকার–এমন একটি দোকান ঢাকায় আছে কি না ও জানে না–থাকতেও পারে–পৃথিবীর সব খবর ওর নখদর্পণে থাকবে এটা ভাবার কারণ নেই।

দময়ন্তী বলে, কেমন দোকানটা?

সুন্দর।

কিনবে কিছু?

হ্যাঁ, একটা মুখোশ।

পছন্দ করো।

একটি চিকন লম্বা কাঠের ওপর সারি করে লাগানো ঘোট ঘোট বারোটা মুখোশের একটি পিস ও কেনে। দময়ন্তীকে বলে, এটা দিল্লি হয়ে ঢাকা পর্যন্ত যাবে তো? নাকি টুকরো হয়ে যাবে?

তুমি কীভাবে নেবে তা তোমার ওপর নির্ভর করবে।

তোমার কোনো কায়দা জানা নেই?

আমি দোকানদারকে বলছি ভালো করে প্যাক করে দেয়ার জন্য।

এটা যদি ভেঙে যায় তুমি কিন্তু আমাকে আর একটি কিনে পাঠিও।

পাঠাব। এটা কোনো কঠিন কাজ নয়। আমার মনে হয়েছিল তুমি এমন জিনিসই বেশি পছন্দ করবে।

থ্যাঙ্কু। তন্ময় গম্ভীর হয়ে ওকে ধন্যবাদ জানায়। যেন ওর কাছ থেকে জিনিসটি পেয়েছে এমন ভাব দেখায়। দময়ন্তী সেটি খেয়াল না করেই খুশি হয়। বলে, চলো শাড়ি দেখবে। এখানে বেশ কয়েকটা শাড়ির দোকান আছে, অনিমার জন্য কিনতে পারো।

চলো দেখি। কী ধরনের শাড়ি আছে।

বুটিক শপ দেখতে পারো। সুচের কাজ করা শাড়িও তোমার পছন্দ হবে আমার বিশ্বাস।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি আমার নাড়ি-নক্ষত্র সবকিছু জেনে বসে আছ। মায়ের জন্য শাড়ি কিনব না?

চলো, শাড়ি দেখার আগে চা খাই।

ছোট্ট একটি চায়ের দোকান–পরিচ্ছন্ন–দু'জনে বেশ আমুদে মেজাজে চেয়ার টেনে বসে–ওখানে বসেই দেখা যায় সামনের গোল চত্বর–মাঝখানে মঞ্চ আছে খোলা মঞ্চ–চারপাশে ছেলেমেয়েরা ভিড় করে আছে–গানের প্রবল শব্দে তন্ময়ের কানে তালা লাগার উপক্রম–কিন্তু পপ গানের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের অনেকে নাচছে–তারুণ্যের উদ্দীপনা দেখতে বেশ লাগে।

ওদেরকে চা সার্ভ করার আগেই একজন ঢোকে–তাকে দেখে দময়ন্তী মৃদু হেসে বলে, এসো। তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার বন্ধু অবনীশ। এ সময়ে আমি ওকে এখানে আসতে বলেছিলাম তোমার সঙ্গে পরিচয় করে দেব বলে।

কেমন লাগল দময়ন্তীকে?

অবনীশ মৃদু হেসে বলে।

কেন এমন প্রশ্ন করলেন?

আপনাদের ই-মেইলে বন্ধুত্ব। কেউ কাউকে তো আগে দেখেননি, তাই।

আপনার কেমন লাগে দময়ন্তীকে?

একজন বন্ধুকে যেমন লাগা উচিত তেমন। নিশ্চয় ভালো লাগে, নইলে তো বন্ধুত্ব টিকত না।

বেয়ারা চা দিয়ে যায়। দময়ন্তী আর এক কাপ দিতে বলে। অবনীশ তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলে, স্যান্ডউইচের অর্ডার দেই?

আমি খেতে পারব না। দুপুরে গাদা গাদা খাওয়া হয়ে গেছে।

দময়ন্তী দারুণ হোস্ট।

বুঝেছি আপনার অভিজ্ঞতা বেশ কড়কড়ে। আপনি ভীষণভাবে আপ্যায়িত হন ওর বাড়িতে, না?

অবনীশ স্মার্টলি বলে, তা হই। স্বীকার করতে কোনো সংকোচ নেই।

তন্ময় পূর্ণ দৃষ্টিতে অবনীশকে দেখে–বেশ লাগে দেখতে–যেমন হলে নারীরা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয় তেমন চেহারা–নিজেই খানিকটা দুর্বলতা অনুভব করে এবং একই সঙ্গে লজ্জিত নিজেকে বকা দেয় এই ভেবে যে, লাটাইয়ের সুতো ছাড়ার সীমা থাকা উচিত–ও সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অবনীশ কণ্ঠে কৌতুক নিয়ে বলে, কিছু ভাবছেন?

ও সপ্রতিভভাবে বলে, হ্যাঁ।

কী? অবনীশের কণ্ঠ বেশ ভারী।

ও চুপ করে থাকে–চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দেয়–বেশ স্বস্তি হয়–অবনীশের দিকে তাকায় এবং মুগ্ধতা প্রকাশে দ্বিধা করে না।

আপনার ভাবনার কথা বললেন না?

আপনি কি আমাকে পৌঁছে দিতে এয়ারপোর্টে যাবেন?

সেজন্যই তো এখানে জড়ো হয়েছি। দময়ন্তীর হুকুম।

তাই তো, ও মিনমিন করে।

দময়ন্তী আর অবনীশ হো-হো করে হাসে–ওর ভীষণ ক্রোধ হয়–কিন্তু প্রবলভাবে নিজেকে সংযত রাখে, মনে হয় ও দময়ন্তীকে বোকা-গাছা ভেবেছে–আসলে গাধা ও নিজেই–কারো কারো ছদ্ম আবরণ খুলতে সময় লাগে। দময়ন্তী ছদ্ম আবরণে ঢাকা নারী–ওর কাছে অস্পষ্ট এবং রহস্যময়ী। ও আকস্মিকভাবে বলে, আমার এখন এয়ারপোর্টে চলে যাওয়া উচিত।

তুমি এখনো অনায়াসে আমাদের সঙ্গে আরো এক ঘন্টা কাটাতে পারো।

বিমানবন্দরে যাই–আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে অনেক সময় বেশ সময় লেগে যায়।

আপনার আর আমাদের সঙ্গ ভালো লাগছে না?

অবনীশ বাঁকা চোখে তাকায়।

আপনি বিগড়ে গেলেন কেন বলুন তো?

বিগড়াইনি তো।

বিগড়াচ্ছ কি না জানি না। তবে তোমার মুড অফ হয়ে গেছে। যাকগে, চলো যাই। ওঠো অবনীশ। তবে মনে রেখো ঢাকায় গেলে আমি আর অবনীশ একসঙ্গে যাব। একই রুমে থাকতে দিও কিন্তু।

থাকবে। তার জন্য আবার অনুরোধ করছ কেন?

শহরটা তো অচেনা।

তাতে কী? তুমি তো জনে জনে বলে বেড়াবে না যে তুমি আর অবনীশ বন্ধু।

যদি বলি?

তাতে অসুবিধে হবে না। বলেছি না ডাস্টবিন। এখানেও নানা কিছু চলে। তোমাদের ভয় নেই অবনীশ এবং দময়ন্তী।

তন্ময় হো-হো করে হাসে–হেসে উড়িয়ে দেয় নিজের ভেতরের নানা অর্বাচীন চিন্তা–এই তো মাত্র গতকাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে জবাই করে ফেলে রেখে গেল ধর্ষকরা–বিশ্ববিদ্যালয়ের মালি ওর বাঁচাও বাঁচাও ডাক শুনে তিন দিন পরে ঘন গাছপালার ভেতর থেকে উঠিয়ে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে–ধর্ষিত, গলাকাটা মেয়েটি কীভাবে এ ক'দিন বেঁচে ছিল এটা একটি প্রচণ্ড বিস্ময়–

ওই অবস্থায় মেয়েটি ধর্ষকদের বিচার চেয়েছে–বিচারের আশায় ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে–ও এখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে।

বিচার! ডাস্টবিনের ভেতরে বাস করা মানুষেরা এভাবেই খুন হয় এবং বিচার পাওয়া কঠিন–প্রায়শ হয়ই না–যে শহরে ওর প্রতিদিনের জীবনযাপন করা–যেখানে বিচার সাধারণ মানুষের বাইরে–যেখানে ধর্ষকরা ক্রমাগত আইনের বাইরে থাকে–সেখানে অবনীশ এবং দময়ন্তী তো মিউচুয়ালি একসঙ্গে একঘরে থাকবে–তারা তো পরস্পরের দায় নিয়ে থাকবে–তার সঙ্গে ধর্ষণের কোনো সম্পর্ক নেই–তবে কেন ও ওই গার্মেন্টস কারখানার মেয়েটিকে মাথায় নিয়ে দিল্লিতে যাচ্ছে–কারণ দিল্লির শান্তি-সংগঠকরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ নিয়েছে–তাদের শান্তি-ভাবনা নারীর জীবন থেকে ছুটে যায়–তারা কোনো দিনই খুঁজে পাবে না সেই গলাকাটা মেয়েটিকে যে বেঁচে থাকার শেষ মুহূর্তে বিচার চেয়েছে। তন্ময় সে কথা ওদের না বলে ওঠার তাড়া দেয়।

চলো যাই।

অবনীশ স্খলিত কণ্ঠে বলে, ট্রেঞ্চ।

তন্ময় ওর দিকে তাকায় না জানে ওর অভিব্যক্তি এমনই–যে কেউই চট করে বলতে পারবে না যে ওর ভেতরে কোথায় কী তোলপাড় হচ্ছে।

বিমানবন্দরের ভেতরে ঢোকার আগে

বিমানবন্দরের ভেতরে ঢোকার আগে ওরা ওকে বিদায় জানায়। এ সীমানার পরে ওরা আর যেতেও পারবে না। বলে, আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।

অবনীশ হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ, কোথাও না কোথাও তো হবেই। পৃথিবীটা খুবই ছোট।

তোমারও কি তাই মনে হয় দময়ন্তী?

হয়ই তো। অবনীশ বলেছে বলে নয়, আমিও এটা বিশ্বাস করি। নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

তাই যেন হয়। আসি।

দময়ন্তী ওকে জড়িয়ে ধরে–অবনীশ হাত মেলায়। মৃদুস্বরে বলে, ভালো থাকবে।

তন্ময় ট্রলি ঠেলে ভেতরে ঢুকে যায়। পেছনে তাকায় না—এটা ওর অভ্যেস নয়–ওর মনে হয় ওরা দাঁড়িয়ে আছে–আবার দেখা হবে এই বিশ্বাস ওর নিজেরও আছে–ও অভ্যেস ভেঙে পেছন ফিরে তাকায়–দেখে ওরা দাঁড়িয়ে আছে–ওকে হাত নেড়ে বিদায় দেয়।

প্লেনে বসে তন্ময়ের মনে হয় ই-মেইলে বন্ধু হওয়া দময়ন্তী কিংবা লন্ডনে দেখে আসা নীলিমা, মাধবী, জুলিয়ানার সঙ্গে অনিমার কোনো মিল নেই। অনিমা এদের মতো করে এখন পর্যন্ত জীবনকে দেখেছে বলে ওর মনে হয় না। তাহলে অনিমা কি বিয়ের পরে জীবনকে নতুন করে দেখতে শিখবে? নাকি ও নিজের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ না করে পরিস্থিতি মেনে নিয়ে জীবন কাটাবে? কোনটা হবে অনিমার ঠিকানা? শান্ত, নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ পরিবেশে বড় হওয়া অনিমার আসলে জীবনকে দেখাই হয়নি। এইসব নারীর ভাবনা অনিমার জীবনে শক্ত অবস্থান তৈরি। করেনি। তন্ময় সিটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ভাবে, অনিমার কী আছে এখনও ওর জন্য অপেক্ষা করে? মুহূর্তে ধড়মড় করে আবার সোজা হয়ে বসে। বিচলিত বোধ করে। আতঙ্কিত হয়। পাশের সিটের ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলে, কিছু হয়েছে?

নো। থ্যাঙ্কস।

তন্ময় নিজের উৎকণ্ঠায় বিব্রত বোধ করে। পাশ দিয়ে চলে যাওয়া এয়ারহোস্টেসকে বলে, আমাকে একটু পানি দেবেন? ওর মনে হচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ও

যেন নতুন অনিমাকে দেখতে পাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও অবে, অনিমা যদি বদলে যায় তাহলে ও। অনিমাকে বোঝার মতো অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছে। এটাকে কি ও জ্ঞান বলবে? হ্যাঁ, জ্ঞানও বলা যায়। অবশ্যই ও জ্ঞান লাভ করেছে, শিখেছে। এটা ভাবতেই ওর মাথা হালকা হয়ে যায়। ও নড়েচড়ে বসে। উইনডো সিটটা পেয়েছে বলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে নীলিমা দেখে। আবার মন খারাপ হয়ে যায়। অনিমা কি ওর ওপর আস্থা রাখতে পেরেছে? ওর লেখা একটা চিঠিও কি অনিমা পেয়েছে? নীলিমাজুড়ে অনিমার মুখ ভেসে ওঠে। মনে হয়, ও একটি অন্যরকম মেয়ে, মাধবী বা নীলিমার মতো জীবনের শিক্ষা না থাকলেও ও নিশ্চয় পরাভূত হবার নয়। তন্ময় আবার আশ্বস্ত হবার চেষ্টায় সিটের গায়ে হেলান দেয়। পাশের যাত্রীটি আবার বলে, কিছু হয়েছে?

না তো! আমি ঠিক আছি।

এতক্ষণে পাশের যাত্রীটির ওপর ও বিরক্ত হয়। তবে রাগতে পারে। পরক্ষণে নিজেকে শাসায়। ও তো অস্থিরতা দমাতে পারছে না এবং তা কোনো না কোনোভাবে ওর আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে। পাশের যাত্রীটি নিঃসন্দেহে একজন তীক্ষ্মধী ব্যক্তি–সরাসরি ওর মুখের দিকে না। তাকিয়ে ঠিকই ওর অস্থিরতা অনুভব করতে পারছে। তিনি কি একজন মনস্তাত্ত্বিক, নাকি লেখক? ও ওর ভাবনায় নিচুপ হয়ে যায়।

প্লেন ল্যান্ড করার আগে পাশের যাত্রী ওকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি দিল্লিতে থাকেন?

না, ঢাকায়। একটা ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করব।

কত দিনের?

দিন পনেরো।

দ্রলোক তার কার্ড দিয়ে বলে, সময় পেলে আসবেন।

তন্ময় তাকিয়ে দেখে, তিনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। চেম্বারের ঠিকানা আছে। ও মৃদু হেসে বলে, থ্যাঙ্কু। প্লেন ততক্ষণ মাটি ছুঁয়েছে। রানওয়েতে দৌড়ে যাচ্ছে। সিট বেল্ট খোলার শব্দ উঠেছে, প্লেন থেমে গেলে সবাই মাথার ওপরের লকার থেকে ছোটখাটো ব্যাগগুলো নামায়। ভদ্রলোক পায়ের কাছে রাখা নিজের ব্যাগটি তুলে নিয়ে বলে, আসি।

তন্ময় ঘাড় নাড়ায়। ও জানে তার দেয়া কার্ড ওর কোনো কাজে আসবে না। ওর মানসিক অবস্থা এখনো সে পর্যায়ে পৌঁছায়নি। ও ধীরেসুস্থে নামার জন্য অপেক্ষা করে এবং শেষ পর্যন্ত এয়ারক্র্যাফটের শেষ যাত্রী হয়ে সিড়িতে পা রাখে।

দিল্লিতে কয়েকটা দিন ওর হাওয়ার বেগে উড়ে যায়। ওয়ার্কশপের পাশাপাশি নতুন দিল্লি, পুরনো দিল্লি মিলিয়ে পাঁচশ ছবি তোলে। সবচেয়ে অবাক হয় সড়ক দ্বীপে চাদর জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা নতুন দিল্লিতে বাসকারী গৃহহীন মানুষদের ছবি তুলে। ভাবে, দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানকারী দেশের রাজধানীর প্রথম আলোর সকাল এমনই! মানুষকে ভাত ও গৃহ দেয়ার বদলে প্রতিযোগিতা করে অস্ত্র ও বোমার পাল্লায়। কে ঠেকাবে কাকে!

ক্যামেরা ব্যাগে ঢোকানোর সময় রাতের উপার্জনকারী একটি কিশোরী কাছে এসে বলে, আমার একটা ছবি তুলবেন?

তুলতে পারি, কিন্তু ছবি তো তোমাকে দিতে পারব না।

আমি তো ছবি চাই না।

তাহলে কী চাও?

টাকা। বিশ টাকা দিলেই হবে।

তোমার ছবি দিয়ে আমি কী করব?

উপার্জন করবেন।

উপার্জন?

হ্যাঁ, দিল্লির একটি মেয়ে যে শরীর বিক্রি করে তার ছবি পত্রিকায় দিতে পারবেন, এক্সিবিশন করতে পারবেন, এমনই। আপনিও টাকা পাবেন।

টাকা আমি পাব কি-না জানি না। তবে তোমার একটি ছবি আমি তুলব।

গাঢ় লাল রঙের লিপস্টিকটা কি লাগাব?

দরকার নেই।

সন্ধ্যায় যখন সাজি তখন ওই লিপস্টিকটা লাগাই। সারা রাতের কাস্টমাররা শুষে নিয়েছে।

তুমি এখানে দাঁড়াও।

ক্লান্ত, বিষণ্ন মেয়েটির চোখজোড়ায় যেন পরাজিত মানুষের ছায়া। তন্ময় শিহরিত হয়। এমন চোখ ও আগে দেখেনি। ছবি তোলা হলে টাকা দিতে দিতে বলে, তোমার নাম কী?

আমার তো অনেক নাম। কাস্টমাররাই নাম দেয়। মায়ের রাখা নাম আমার মনে নেই। আপনিও আমাকে একটা নাম দিতে পারেন। আপনিও তো আমার কাস্টমার।

কাস্টমার? তন্ময়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

মেয়েটি খিলখিল হাসিতে দিনের প্রথম আলো ভরিয়ে দেয়। বলে, কাস্টমার না হলে টাকা দিলেন কেন? আমরা তো পোলাও খাই, আবার মুড়িও খাই। সব খাওয়া কি একরকম!

আশ্চর্য! তন্ময় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, কত বয়স হয়েছে ওর? মেয়েটি খিলখিল হাসি হেসে বলে, আপনি এখানে এলে আমাকে পাবেন। আমি এই এলাকার চারপাশেই থাকি। আসবেন কিন্তু, এই সময়ে। আমি আপনার অপেক্ষায় থাকব।

অপেক্ষায়! তন্ময়ের মাথা বনবন করে। দেখতে পায় মেয়েটি উল্টো দিকের ফুটপাথে উঠে চলে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে বলে আসতে, আমার অপেক্ষায় তুমি থেকো না। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো দিন দেখা হবে না। কিন্তু কী লাভ? এটাই বোধহয় ওর উপার্জনের ভাষা। ও সবাইকে এভাবেই বলে হয়তো। নিজেকে যুক্তি দেখিয়ে খানিকটুকু সান্ত্বনা খোঁজে তন্ময়।

দুদিন পর ঢাকায় ফিরে মাকে ঘটনাটা বলে ও। সাবিহা বানু এক। মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, সখিনাকে তুই আমার কাছে নিয়ে না এলে ও হয়তো এভাবে নিজের জায়গা খুঁজে নিত সোনা।

তন্ময় চেঁচিয়ে বলে, তুমি আমার কথা বললে না কেন? আমিও তো...

চুপ কর, চুপ কর বলছি। তুই শুধু আমার ছেলে, শুধু আমার।

সাবিহা বানু হিংস্র কণ্ঠে কথা বলে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। তন্ময় মাকে জড়িয়ে ধরে কোলে মুখ গুঁজলে ওর মনে হয় একটি বিশাল সত্য প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে দুজনের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে–দুজনকেই এই সত্য কুরে খায়। কখনো সেটা সামনে আসে, কখনো অদৃশ্য থাকে–তারপরও সম্পর্কের সুষম টানের ফাঁক গলিয়ে সেই সত্য নাক গলায়। উপায়হীন জীবনের নির্মম কষ্ট।

অনিমার সামনে এখন অসীম শূন্যতা। চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ধরা হয়েছে–বড় বাধা বাবা, সেই সঙ্গে বাবার ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং মেয়ের নিরাপদ জীবন দেখার তীব্র বাসনা ওকে দমিয়ে রাখে। এই বাঁধন ছিড়ে বেরিয়ে আসার ওর কোনো উপায় নেই। ও সব কিছু বাদ দিয়ে তো 'আমি' হতে শেখেনি। ও বাবাকে অস্বীকার করবে কীভাবে? অনিমার দিনগুলোতে অন্ধকার ভরে থাকে। এরপরও স্টেশনে ট্রেন এলে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। না, তন্ময় নামে না। দুদিনের মাথায় দেখতে পায় সাদেক আলী ও তার ছেলে তারেক ট্রেন থেকে নামছে। অনিমা বুঝে যায় বাবা আর অপেক্ষা করবে না। সবই গুছিয়ে ফেলেছে। তার চাচাতো ভাই আর ভাইয়ের। ছেলেকে আনিয়েছে। ও ছুটে ভেতরে আসে। পাখি বানিয়ে রাখা চিঠির ব্যাগটা টান দিয়ে নামিয়ে ঘরময় উড়িয়ে দেয়–কত দিকে গড়িয়ে যায় পাখিগুলো। ও চৌকিতে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে থাকে। ওর শরীর হিম হতে থাকে, এক সময় ওর মনে হয় ওর ঘুম পাচ্ছে–ও একগাদা কাগজের পাখি বুকে জড়িয়ে চৌকির সঙ্গে মাথা হেলায়।

অতিথি নিয়ে বাড়ি এসে তৌফিক অনিমাকে এই অবস্থায় দেখে আঁতকে ওঠে। ওর কাছে উবু হয়ে বসে আস্তে করে ডাকে, মা। অনিমা ঘোলা চোখে বাবাকে দেখে।

কী হয়েছে মা?

কিছু তো হয়নি বাবা।

তুই ভালো আছিস তো মা?

ভালো তো আছি।

ইয়ে মানে–ওরা এসেছে–তুই—

আমাকে নিয়ে তুমি কিছু ভেব না বাবা। তুমি আমাকে কত ভালোবাসো–তোমার ঋণ কি আমি শোধ করতে পারি! বাবা আমাকে দিয়ে তোমার কোনো অবমানো হবে না।

সত্যি বলছিস মা?

হ্যাঁ বাবা।

তৌফিক খুশি মনে উঠে যায়। অনিমা শুনতে পায় ওর বাবা সাদেক আর তারেকের সঙ্গে উঁচু স্বরে কথা বলছে। ও বুকের সঙ্গে খুঁতনি ঠেকিয়ে বলে, ভালোবাসাহীন জীবনের একটি বিয়ে, পুরো জীবনের আর কতটুকু খাবে? দেখতে হবে আর একটি ভালোবাসার অপেক্ষায় জিততে পারে কি-না। এ অপেক্ষা তারেককে নিয়ে। এভাবে বেশ ভালোই একটি সময় গেল। সামনে কী আছে অনিমা জানে না–ও জানার জন্য ভাবতে চায় না, ওর মাথা ভার হয়ে যায় এবং বুঝতে পারে বুকের ভেতরের সব জায়গাটুকু জুড়ে নুড়ি বিছানো। কখনো সেসব নুড়ি আশ্চর্য ধ্বনিতে টুংটুং করে–ওর কিছু করার নেই, শুধুই কান পেতে থাকে। অনিমা নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে।

দুদিন পরে বিয়ে।

রঙিন কাগজে দিয়ে স্টেশন মাস্টারের বাড়ি সাজানো হয়েছে। অনিমার ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মাসুম। মনের সুখে ওরা রঙিন কাগজ কেটে ফুল বানাচ্ছে, নৌকা, পাখি, হাতি, ঘোড়া নানা কিছু বানাতে চাইছে। কখনো ঠিকমতো হয়, কখনো হয় না–তাতে কি, পুরো বাড়ির দেয়াল ভরে যাচ্ছে সেসব নকশায়। মাসুম মাঝে মাঝে অনিমার সামনে এসে দাঁড়ায়–কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না। আসলে ওর বলারও কিছু নেই। মানুষটি যে এখান থেকে গেল আর কোনো খবর নেই। ঠোঁট উল্টে বলে, এমন ভবঘুরে মানুষের সঙ্গে আপার বিয়ে না হওয়াটাই ভালো। কোন দিন আবার আপাকে রেখে কোথায় উড়ে যাবে, কে জানে! ভালোই হয়েছে। ও ছেলেমেয়েদের তাগাদা দিয়ে জিঞ্জির বানানো শেষ করে। গেটের উপর ওটা ঝোলাতে গিয়ে আকস্মিকভাবে ওর খুব মন খারাপ হয়ে যায়। ওর দুচোখ ভেসে যায় জলে।

কান্দেন ক্যান মাসুম ভাই?

আপা যে থাকবে না সেজন্য মন পোড়ে।

ঠিক। আমারও দুঃখ লাগে।

অন্যরা হৈচৈ করছে। মাসুম দুহাতে চোখ মুছে ওদের সঙ্গে মিলে যায়।

পরদিন বিয়ে। কনে সেজে বসে থাকে অনিমা। চমৎকার বেনারসি শাড়ি এনেছে, সঙ্গে হালকা গয়না, কসমেটিকস। অনিমা তাকিয়ে দেখেই বোঝে যে ওদের সাধ্য অনুযায়ীই ওরা এনেছে। একটু পরেই বরের বেশে তারেক ঢুকবে বাড়িতে। সবটাই খুব সাজানো, খুবই সংক্ষিপ্ত মনে হয় অনিমার। জীবনের বিশাল একটি পর্ব কেমন ধূলিমলিন বাস্তবতায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এই পর্ব আর টেনে তোলা যাবে না। ওটাকে ধুলোবালির নিচে আড়াল করে টেনে তোলা যাবে না। এর বেশি কিছু ও আর ভাবতে পারে না। ভাবাটা সঙ্গত নয়। শুধু তন্ময়ের স্মৃতি বুকের ফ্রেমে উজ্জ্বল। যে ছবি তন্ময় উঠিয়েছিল তার কোনো কপি অনিমার কাছে নেই। কথা ছিল তন্ময় ঢাকায় গিয়ে প্রিন্ট করে আনবে। অনিমা নিজেকে শক্ত করে বলে, ওই ছবিগুলো আমি চাই না। তুমি তো কত জায়গাতেই যাও, কোনো এক জায়গায় ফেলে দিও। তন্ময় এখন ওর স্মৃতির মানুষ। বিয়ে পড়ানোর সময় তৌফিক নিজের মেয়েকে চিনতে পারে না। তৌফিকের বুক মুচড়ে ওঠে, ও এতটাই অচেনা হয়ে গেল কেন? এই অন্য অনিমা কি আমার মেয়ে? তৌফিকের কান্নায় উপস্থিত সকলে চমকে ওর দিকে তাকায়।

গভীর রাতে তারেক অনিমাকে বলে, চলো বাইরে যাই।

বাইরে।

হ্যাঁ, দেখো কী সুন্দর পূর্ণিমা। তুমি চাইলে আমরা রেললাইন ধরে অনেক দূর চলে যেতে পারি। যাবে?

স্টেশনের প্লাটফর্ম পর্যন্ত যেতে পারি। এর বেশি নয়।

তারেক ওকে বুকে নিয়ে বলে, এত ছোট স্বপ্ন! তোমাকে ছাড়া আমি। কখনো কারো কথা ভাবিনি। তোমাকে না পেলে আমি বিয়ে করতাম না। সারা জীবন একা থাকতাম। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, একটুও মিথ্যে না।

দুজনে হাত ধরে বাইরে আসে। সুনসান রাত। পাখির ডাকও নেই। শুধু ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চরাচর প্লাবিত হয়ে আছে। প্লাটফর্মের কাঠের বেঞ্চে দুজনে বসলে অনিমার মনে হয় পূর্ণিমা আছে বলে দুঃখ। খোলা যায়। তারেকের মতো ছেলেদের হৃদয়জুড়ে পূর্ণিমা।

একদিন পরেই বিকেলে ট্রেন আসার শব্দে মুচড়ে ওঠে অনিমার বুক। ও নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে না। স্মৃতি এখনো ভীষণ তাজা। সামাজিকভাবে ওর আর কারো জন্য অপেক্ষা করার অনুমোদন নেই। কিন্তু বুকের গভীরে নিজেকে আড়াল করবে কোথায়? ও জায়গাটুকু ওর একার। ওখানে ও যে কাউকে রাখতে পারে, যে কারো কথা ভাবতে পারে যতদিন খুশি ততদিন। ও দু-কান ভরে ট্রেনের শব্দ শোনে–শুনতে ওর ভালো লাগে। সেই আনন্দ নিয়ে তারেককে বলে, তুমি চা খাবে?

না, এখন চায়ের দরকার নেই। চলো দুজনে ঘুরে আসি। রাস্তার ধারে মকবুল মিয়ার দোকানের বেঞ্চে বসে চা খাব। যাবে?

হ্যাঁ যাব। ওই চা খেতে ভীষণ মজা পাই।

মজা কেন?

ওরা যেভাবে চায়ের পাতা সেদ্ধ করে চা বানায় সেটাই আমার মজা। আমরা তো ওভাবে চা বানাতে পারি না।

হাসতে হাসতে তারেক বলে, তাহলে চলো যাই।

একটু অপেক্ষা করো। হাতের কাজটুকু সারি।

বেশি দেরি করা চলবে না কিন্তু।

একদমই না। আসছি।

তার একটুক্ষণ আগে তন্ময় নেমেছে ট্রেন থেকে।

ওর কেমন অচেনা লাগে ফুলসি স্টেশনকে, কোথায় যেন কী ঘটেছে–দারুণ আকাল চারদিকে এই দুর্ভিক্ষপূর্ণ এলাকাটি ওকে মর্মাহত করে। নাকি বিদেশ থেকে ঘুরে আসার কারণে এই অখ্যাত স্টেশনটি ওকে টানতে পারছে না! নাকি এখানে কোনো বিপর্যয় ঘটেছে? তন্ময় নিজেকে প্রশ্ন করে কিন্তু বুকের ভেতরে উত্তর পায় না। ট্রেন থেকে এখানে নামার পরেই বুকের ওই জায়গাটা অসার হয়ে আছে।

আর দূর থেকে তন্ময়কে দেখে মাসুমের হাত থেকে সবুজ পতাকাটা পড়ে যায়। ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পতাকাটা ওঠাতেও মনে থাকে না। ট্রেন চলে গেছে। যাত্রীরাও কেউ নেই। তন্ময় ওকে দেখে এগিয়ে আসে। ও পতাকাটা উঠিয়ে মাসুমের হাতে দিয়ে বলে, কেমন আছ মাসুম?

আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন তন্ময় ভাই?

আমার কি থাকার জায়গার অভাব? যেখানেই যাই সেখানেই ঠাঁই।

মাসুমের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা দেখে বলে, কী হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন? মনে হচ্ছে তোমার খুব কষ্ট।

মাসুম আস্তে করে বলে, তাহেরা চাচি মারা গেছে।

কবে?

দুদিন আগে। আমি নিজের হাতে কবরে নামিয়েছি।

ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে ও বাড়িতে যাব। ফজর আলি আর হনুফাঁকে ছবি দিয়ে আসব। অনিমা কেমন আছে মাসুম?

জানি না।

জানো না? সেজন্য তুমি অনিমার কথাই বলছ না। বেশ মজার ছেলে তুমি! মাস্টার সাহেব অফিসে আছেন?

না বাড়িতে।

তাহলে চলো আমরাও বাড়িতে যাই। তোমার সঙ্গে কথা বলে কতটা সময় পার করে দিলাম।

আপনি যান, আমার কাজ আছে। আর দশ মিনিটের মধ্যে উল্টো দিক থেকে আর একটা ট্রেন আসবে।

মাসুমের কথাগুলো খুব কাটা কাটা মনে হয়। তন্ময়ের কানে খট করে বাজে। তারপরও ওর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, বুঝতে পারছি কোনো কারণে তোমার মুড অফ। যাকগে আমি যাই।

প্লাটফর্ম পার হতেই কাগজের ফুল-পাতায় সাজানো বাড়িটা ওর চোখে পড়ে। তন্ময় থমকে দাঁড়ায়। মনে হয় কাগজগুলো ম্যাথুর টেবিলে রাখা রঙিন পাথর। বর্ণিল দ্যুতিতে ফুলর্মসি স্টেশনে অদ্ভুত আলো ছড়িয়েছে। তাহলে কিছুক্ষণ আগেও কেন জায়গাটিকে দুর্ভিক্ষপূর্ণ মনে হয়েছিল ওর? তন্ময় ফিরে আসে মাসুমের কাছে।

অনিমাদের বাড়িটা অমন সাজানো কেন মাসুম?

দুদিন আগে আপার বিয়ে হয়েছে।

ওহ! তন্ময় মাসুমের ঘাড়ে হাত রাখে। বলে, যে ট্রেনটি আসবে বললে আমি ওই ট্রেনে উঠব।

ওটা তো ঢাকায় যাবে না।

যেদিকে খুশি সেদিকে যাবে। যাওয়া হলেই হয়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাসুম সবুজ পতাকা ওড়ায়। তন্ময় দেখতে পায় দ্রুতগতিতে আসা ট্রেনটা গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে স্টেশনে ঢুকছে। ও মাসুমের দিকে একটি ছোট ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে বলে, এটা অনিমাকে দিও। এর ভেতরে আমার তোলা ওর কয়েকশ' ছবি আছে।